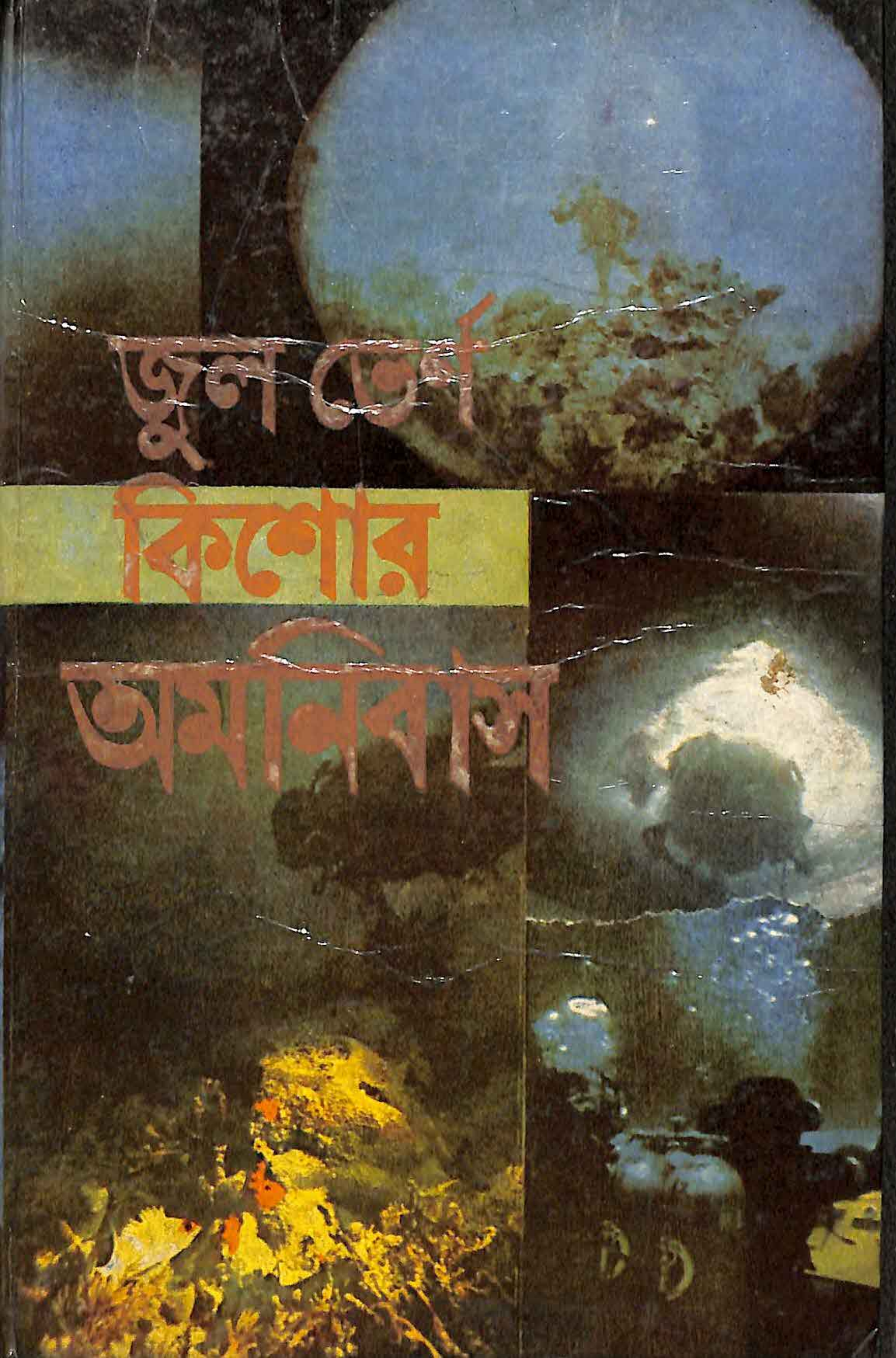

জুল ভের্ন
কিশোর
অমনিবাস

জুল ভের্ণ কিশোর অমনিবাস

শৈবাল চক্রবর্তী অনূদিত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৮৯
সেপ্টেম্বর ১৯৮২
প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদ
গৌতম রায়
মুদ্রাকর
প্রফুল্ল কুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৩৫ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

১৫·০০ টাকা

অনুবাদকের নিবেদন

'তুষারে পদচিহ্ন' আসলে জুল ভের্নের 'দি ইংলিশ এ্যাণ্ড দি নর্থ পোলের' একটি পরিচ্ছেদ। কিন্তু এতে একটি ছোট গল্পের স্বাদ থাকায় এবং মূল উপন্যাসটি সম্পর্কে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে এই সংকলনে এটি একটি গল্প হিসেবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সূচীপত্র

টোয়েণ্টি থাউজ্যাণ্ড লিগস আণ্ডার দি সী

প্রবহমান সময়ের আবর্তনে ১৮৬৬ সালটি একটি বিশেষ ঘটনার জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই বছর এমন একটি রহস্যময় ও দুর্বোধ্য ঘটনা ঘটেছিল যা ভুলে যাওয়া আজও সম্ভব হয় নি মানুষের পক্ষে।

শুধু সমুদ্রতীরের মানুষ নয় অগণিত সাধারণ মানুষও এই খবর শুনে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে সমুদ্রে ভ্রমণকারী যাত্রীদের মধ্যে এই সংবাদ প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। এ ছাড়া আমেরিকা ও ইউরোপের বণিক সম্প্রদায়, জাহাজের কর্মচারী ও বিভিন্ন সরকারেরও এই যুগান্তকারী সংবাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল।

কী ঘটেছিল এবার তা বলা যাক। কিছুদিন ধরে সমুদ্রে চলাচলের সময় জাহাজগুলি জলের মধ্যে এক অতিকায় প্রাণীর দেখা পাচ্ছিল। এই প্রাণীর মুখের দিকটা ছুঁচলো এবং আকারেও তিমির চেয়ে অনেক বড়। এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হল তার অস্বাভাবিক দ্রুতগতি, অপরটি তার পিঠের ওপর ফসফরাসের মত একটা উজ্জ্বল আভা।

অদ্ভুত-দর্শন এই জীবটির গতিবেগ ও আকৃতি সম্বন্ধে নানা খবর আসছিল। কেউ বলল, এর দৈর্ঘ্য দুশো ফুটের মত আবার যাদের সব কিছুই বাড়িয়ে বলা স্বভাব তাদের মতে প্রাণীটি এক মাইল লম্বা ও তিন মাইল চওড়া। দু পক্ষের দু রকম হিসেবকে বিচার করে এইটুকুই বলতে পারা যায় যে এই প্রাণীটির অস্তিত্বের কথা যদি সত্যি হয় তবে তা মৎস্য বিজ্ঞানীদের সমস্ত জ্ঞান ও তথ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুলাই ক্যালকাটা এণ্ড বার্নাক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির একটি জাহাজ এই প্রাণীটিকে দেখেছিল অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলের কাছে। নিশ্চলভাবে একে পড়ে থাকতে দেখে ক্যাপ্টেন

বেকার ভেবেছিলেন এটি কোন বালিয়াড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি যখন এর সঠিক অবস্থানটি নির্ণয় করতে যাচ্ছেন তখন এই বস্তুটির পিঠ থেকে প্রবল শব্দ সহকারে দুটি জলের ধারা প্রায় দেড়শো ফুট উঁচুতে ওঠে। দেখে মনে করা হয় যে বালিয়াড়িতে নিশ্চয় কোন উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এ ছাড়া অন্য কোন রকম সিদ্ধান্তের কারণও ছিল না। কেননা তখনও পর্যন্ত এমন কোন জলজ জীবের সন্ধান পাওয়া যায় নি যার দেহের ছিদ্র থেকে গ্যাস ও বাতাস মিশ্রিত জল শূন্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

ওই বছর ২৩শে জুলাই প্রায় একই দৃশ্য দেখল প্যাসিফিক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির 'কলাম্বাস' নামে একটি জাহাজ। এই জীবটি যে কত দ্রুতগতিতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াত করতে পারে তা এইবার বোঝা গেল। প্রথমোক্ত জাহাজটি একে দেখার পর কলাম্বাস একে দেখেছিল মাত্র তিন দিন পরে, অথচ এই দুটি জায়গার মধ্যে দূরত্ব ২৪৫০ সামুদ্রিক মাইলেরও বেশী।

পনেরো দিন পরে আরও দুটি জাহাজ এই মহাকায় জীবটির দর্শন পেল। এই জাহাজ দুটির নাম 'হেলভেশিয়া' ও 'শ্যানন'। দুই জাহাজ থেকে যৌথ পর্যবেক্ষণের ফলে অনুমিত হল যে প্রাণীটির দৈর্ঘ্য অন্তত সাড়ে তিনশো ফুট হবে। জাহাজগুলির নিজেদের দৈর্ঘ্য ছিল তিনশো ফুট করে। সুতরাং প্রাণীটি জাহাজগুলির চেয়ে বড় এই রকম একটা সিদ্ধান্ত করা হল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই যে সবচেয়ে বৃহদাকার তিমি যা উমগালিক দ্বীপগুলির কাছে দেখা যায় তাদের দৈর্ঘ্য খুব বেশী হলেও ষাট ফুটের বেশী হয় না।

একের পর এক রিপোর্টগুলি আসছিল। এরই মধ্যে ইনমান কোম্পানির 'এটনা' জাহাজের সঙ্গে এই দানবীয় প্রাণীটির মধ্যে সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেল। হালকা মেজাজের লোকরা ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশায় মাতল বটে, কিন্তু যারা সব ব্যাপারেই একটু গভীরভাবে চিন্তা করে সেই ইউরোপ ও আমেরিকার লোকরা

বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিল। সাধারণ লোক তাদের মেলামেশার সব জায়গায় প্রাণীটির আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল। রেস্তোরাঁয় ওকে নিয়ে গান বাঁধা হল, খবরের কাগজে ওকে নিয়ে ঠাট্টা করা হল এমন কি রঙ্গমঞ্চে তার প্রতিমূর্তিকে হাজির করা হল বিচিত্র সাজে।

এ তো গেল এই ব্যাপারের লঘু দিকটা। এরপর বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে শুরু হল তুমুল বিতণ্ডা। কেউ এতে বিশ্বাস করেন, কেউ করেন না। বিবাদটা কোন কোন জায়গায় কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না থেকে হাতাহাতি অবধি গড়াল।

যে সমস্ত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এই বিতর্কে যোগ দিল তাদের মধ্যে ছিল ব্রেজিলের জিওগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউশন, বার্লিনের রয়াল আকাদমি অব সায়েন্স ও ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি।

এরপর বেশ কিছুদিন সমুদ্রে প্রাণীটিকে কেউ দেখতে পেল না, তাই এর কথা লোকে ভুলে যেতে লাগল। বছর দুই পরে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। 'মোরাভিয়ান' নামে একটি জাহাজ ওইদিন রাত্রে ১৭·৫০ অক্ষাংশ ও ৭২·১৫ দ্রাঘিমাংশের মধ্যে আটকে গেল। অথচ জাহাজের চার্ট অনুযায়ী ওই অঞ্চলে কোন শিলাখণ্ড থাকার কথা নয়। মোরাভিয়ান ঘণ্টায় তের মাইল বেগে যাচ্ছিল। তলদেশ বিশেষভাবে মজবুত না হলে এই সংঘর্ষের ফলে ২৩৭ জন যাত্রীসমেত জাহাজটির সলিল সমাধি হত।

ধাক্কা সামলে মোরাভিয়ান তার গন্তব্যের দিকে এগোল বটে কিন্তু একটা প্রশ্ন সবার মনে রয়ে গেল, কোন্ বস্তুর সঙ্গে জাহাজের ধাক্কা লেগেছিল। সে মুহূর্তে কেউ কোন উত্তর দিতে পারলেন না। পরে জাহাজ মেরামত করার সময় নাবিকরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে জাহাজের তলার দিকের অংশ ভেঙে গেছে।

ওই বছরই ১৩ই এপ্রিল আবার সমুদ্রের আতঙ্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। সেদিন সমুদ্র ছিল শান্ত ও বাতাস অনুকূল। বিকেল তখন চারটে বেজে সতের মিনিট, স্কোশিয়া জাহাজের বিরাট পানশালায়

যাত্রীরা পানভোজনে ব্যস্ত। ঠিক এমনি সময় জাহাজটা একবার কেঁপে উঠল ভীষণ ভাবে।

স্কোশিয়া জাহাজের গড়নে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। সমস্ত জাহাজের নিচের তলাটি সাতটি ভাগে ভাগ করা ছিল। নিচে নেমে এসে ক্যাপ্টেন এ্যাণ্ডারসন দেখলেন যে আঘাতের ফলে পাঁচ নম্বর কক্ষে একটি ছিদ্র সৃষ্টি হয়েছে যেখান দিয়ে জল হুহু করে ভেতরে ঢুকছে। মোটা লোহার পাত ভেদ করে যে অস্ত্রের দ্বারা এই ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে, বোঝা গেল তা কোন সাধারণ উপাদানে প্রস্তুত নয়।

এই খবরে আবার নতুন করে আলোড়নের সৃষ্টি হল। পর পর এই ধরনের ঘটনা ঘটে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হল যে এরপর থেকে সমুদ্রে কোন দুর্ঘটনা ঘটলেই তার জন্যে এই অতিকায় দানবটিকে দায়ী করা হত। সাধারণ অবস্থায় জাহাজ ডুবি ও জাহাজ নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা কম ছিল না। যে তিন হাজারের ওপর জাহাজ নিখোঁজ হয়েছিল তার সমস্ত দায়িত্ব এখন থেকে গিয়ে পড়ল ওই কাল্পনিক অতিকায় প্রাণীটির ওপর। এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হল যে অবিলম্বে এই আতঙ্ককে সমূলে উচ্ছেদ করে সমুদ্রকে বিপন্মুক্ত করা হোক।

দুই

এদিকে যখন এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে তখন আমি এক বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে আমেরিকার অন্তর্গত দুর্গম নেব্রাস্কা অঞ্চল সফর করে সবে ফিরছি। আমি ছিলুম প্যারিস মিউজিয়ামের জীববিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক। এই পদাধিকার বলেই আমি এই সফরে ফরাসী সরকার কর্তৃক প্রেরিত হয়েছিলুম। নেব্রাস্কায় ছ'মাস ঘোরবার পর মার্চ মাসের শেষদিকে দুর্মূল্য কিছু উপাদান সংগ্রহ করে ফিরে এলুম আমি নিউইয়র্কে।

সবার মুখে তখন ফিরছে এই প্রাণীটির কথা স্কোশিয়া জাহাজের ক্ষত স্বচক্ষে দেখবার পর আমার এই অতিকায় দানবটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ রইল না। যে সমস্ত লোক এই ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিল তারা ক্রমশ তু'দলে ভাগ হয়ে গেল। প্রথম দলের বক্তব্য হল এটি একটি অমিত শক্তিশালী প্রাণী আর অন্য পক্ষ বলল এটি একটি ডুবো-জাহাজ।

আমি নিউইয়র্কে পৌঁছনোর পর বেশ কিছু লোক এই ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্যে আমার কাছে এলেন। ফ্রান্সে থাকতে আমি 'ডুবো-জাহাজের রহস্য' নিয়ে তু'খণ্ড গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলুম। বিদ্বৎ-সমাজে এই বইটি যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল এবং এর ফলে আমি জীবতত্ত্বের এই অপেক্ষাকৃত তুর্বোধ্য বিভাগে একটি সম্মানের আসন পেয়েছিলুম। 'নিউইয়র্ক হেরল্ড' পত্রিকার তরফ থেকে আমাকে অর্থাৎ প্যারিস মিউজিয়ামের অধ্যাপক পিয়ের এ্যারোনাক্সকে এই ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট মত জানাতে বলা হল। বহু আলোচিত এই প্রশ্নটিকে আমি সবদিক থেকে বিচার করে একটি প্রবন্ধ লিখলুম। এই প্রবন্ধ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ নীচে উদ্ধৃত করে দেওয়া গেল।

'এই তুর্ঘটনাগুলির প্রসঙ্গে বিভিন্ন মত ও অনুমান বিচার করে আমার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে অমেয় শক্তিসম্পন্ন একটি প্রাণী মহাসমুদ্রে বিরাজ করছে।

জলরাশির নিচে অবস্থিত সমুদ্রতল আমাদের কাছে সম্পূর্ণ অচেনা। শব্দ সেখানে পৌঁছয় না। জলের সেই নিবিড় গভীরে কি ধরনের প্রাণী থাকে, তাদের জৈব ক্রিয়া কি তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা খুবই কঠিন।...তু'ভাবে আমরা সমস্যাটিকে বিচার করতে পারি। এক, আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের গৃহের সব প্রাণীদের আমরা চিনি না। যদি আমরা স্থির করি যে এমন কোন প্রাণী আছে যার কথা মৎস-বিজ্ঞানে লিপিবদ্ধ নেই, তাহলে এই সিদ্ধান্ত করতে হবে যে এটি এমন এক ধরনের জীব যে সমুদ্রের অতলান্ত গর্ভে

বাস করে এবং মাঝে মাঝে হঠাৎ কোন উদ্ভট কারণে বা নিজের খেয়ালের বশে সমুদ্রের ওপরের স্তরে উঠে আসে।

পক্ষান্তরে আমরা যদি সিদ্ধান্ত করি যে জীবিত সমস্ত প্রাণীই আমাদের জানা তাহলে যে সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণীই আমাদের চেনা তাদের ভেতর থেকেই এই প্রাণীটিকে খুঁজে বার করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমি বলব যে এই জীবটি হল একটি অতি বৃহৎ আকারের দন্তবিশিষ্ট তিমি।

সাধারণত এই জাতের তিমি খুব বড় হলে ষাট ফুটের মত লম্বা হয়ে থাকে। এর আকার পাঁচ থেকে দশ গুণ বাড়লে এবং আকার অনুযায়ী শক্তির কল্পনা করলে তবেই আমরা যে প্রাণীটিকে খুঁজছি তাকে পাব।···তাহলে স্কোশিয়া জাহাজে অমন গভীর ক্ষত কি করে সৃষ্ট হল তা-ও বোঝা অসম্ভব হবে না।

বাস্তবিক পক্ষে, দাঁতাল তিমিদের সাদা রংয়ের তরোয়ালের মত একটি করে অস্ত্র থাকে যাকে কোন কোন জীববিজ্ঞানী কুঠার বলে অভিহিত করেন। এই অস্ত্র ইস্পাতের মত কঠিন। প্যারিসের মিউজিয়ামে এই রকম একটি অস্ত্র রাখা আছে। অস্ত্রটি সওয়া দু গজ লম্বা আর গোড়ার দিকের পরিধি পনেরো ইঞ্চি।

···এ পর্যন্ত বেশ বোঝা গেল। এখন এই ক্ষুরধার অস্ত্রটি যদি ছ' গুণ বেশি শক্ত হয় আর প্রাণীটি যদি দশ গুণ বেশি শক্তিশালী হয় এবং তা ঘণ্টায় বিশ মাইল বেগে ছুটে কোন বস্তুকে আঘাত করে, তাহলে তার যা ফল হয় স্কোশিয়া জাহাজের ক্ষেত্রে আপনারা তাই দেখতে পেয়েছেন। সুতরাং এ সম্পর্কে নতুন কোন তথ্য না পাওয়া পর্যন্ত আমি বলব যে এটি একটি সুসজ্জিত, বিরাটাকৃতি সামুদ্রিক প্রাণী।··· আর যদি আমার সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে তাকে অনুধাবন করা আমাদের সাধ্যের বাইরে।'

···আর কিছু না হোক অতিকায় দানবটির কথা বলে আমি সকলের কল্পনা শক্তির খোরাক জুগিয়ে দিয়েছিলুম। মানুষ অতি প্রাকৃত ও অলৌকিকের কল্পনা করতে ভালবাসে। আস্তে আস্তে সকলে

আমার মতের অনুকূলে চিন্তা করতে লাগল। এই আতঙ্ক সম্বন্ধে সচকিত হয়ে বীমা কোম্পানিগুলি তাদের বীমার হার বাড়িয়ে দেবে বলে নোটিশ দিল। জনসাধারণও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাদের মতামত জানাল। এই দাঁতাল তিমিকে ধরবার জন্যে শুরু হয়ে গেল তোড়-জোড়। 'আব্রাহাম লিংকন' নামে একটি অতি দ্রুতগতি রণতরীকে এই কাজে পাঠানো হবে বলে ঠিক করা হল। জাহাজের কম্যাণ্ডার ফ্যারাগুট তাঁর জাহাজকে রণসজ্জায় সজ্জিত করলেন। শুধু অস্ত্রসজ্জায় নয় যাতে রণতরীটি বহুদূর পর্যন্ত যেতে পারে তার উপযোগী রসদ এবং জলের প্রাণীকে ডাঙায় তোলার নানাবিধ যন্ত্রপাতিও তাতে সাজানো হল। কিন্তু কোন্ নির্দিষ্ট পথে সে যাবে তা তখনও ঠিক করা সম্ভব হল না। অধীর উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল জুন মাসের ২ তারিখে। যখন জানা গেল যে সানফ্রানসিস্কো কোম্পানির একটি স্টীমার ক্যালিফোর্নিয়া ও সাংহাইয়ের মাঝখানে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে ওটাকে দেখতে পেয়েছে। জাহাজে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

আব্রাহাম লিংকন ব্রুকলীন ছেড়ে যাবার ঠিক তিন ঘণ্টা আগে আমি নিম্নলিখিত চিঠিটি পেলাম।

মঁসিয়ে এ্যারোনাক্স

অধ্যাপক, প্যারিস মিউজিয়াম

ফিফথ এভিনিউ হোটেল

নিউইয়র্ক

মহাশয়,

ফরাসী সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে আপনি যদি এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন তাহলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আনন্দিত হবে। আপনার জন্যে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট উক্ত জাহাজে একটি কেবিন সংরক্ষিত রেখেছেন।

একান্তভাবে আপনার

জে. বি. হবসন

সেক্রেটারী, নৌ-বিভাগ।

তিন

জে. বি. হবসনের চিঠি আসার তিন সেকেণ্ড আগেও এই সামুদ্রিক মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবন করবার মত কোন চিন্তা আমার মাথায় উদিত হয় নি। কিন্তু চিঠি পড়বার তিন সেকেণ্ড পরে আমি সিদ্ধান্ত করে ফেললুম যে এই প্রাণীটিকে ধরা এবং তাকে সমূলে বিনাশ করা আমার জীবনের পবিত্র কর্তব্য।

কনসীল আমার পুরনো ভৃত্য। গত দশ বছর ধরে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজনে আমি যেখানে গেছি কনসীল আমার সঙ্গে গেছে। চীনই হোক আর কঙ্গোই হোক যেখানেই গেছি কখনও সে পথশ্রমে ক্লান্ত হওয়ার কথা বলেনি বা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বিরক্ত হয় নি। কনসীলের সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ ছিল দশ বছরের।

—কনসীল। আমি ডাক দিলুম।

—আমায় ডেকেছেন হুজুর? দ্বার প্রান্তে দেখা দিয়ে প্রশ্ন করল কনসীল।

—হ্যাঁ। শোন, আমরা দু'জন এক জায়গায় বেরুব। সব গোছগাছ করে নাও। দু' ঘণ্টার মধ্যে আমরা রওনা দেব।

—আমরা কি তাহলে প্যারিসে ফিরে যাচ্ছি না? প্রশ্ন করল কনসীল।

—নিশ্চয়। তবে একটু ঘুরপথে যাচ্ছি। আমরা 'আব্রাহাম লিংকনে' চড়ে যাচ্ছি সেই প্রকাণ্ড দাঁতাল তিমিটার সন্ধানে। ওটাকে তাড়িয়ে আমরা সমুদ্রকে নিষ্কণ্টক করতে চাই।

এরপর একটা ভাড়াটে গাড়ি ধরে আমি আর কনসীল চটপট আমাদের জাহাজে পৌঁছে গেলুম। মালপত্তর ডেকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি ফ্যারাগুটের খোঁজ করলুম। একজন নাবিক আমাকে জাহাজের পেছন দিকে এক সুদর্শন অফিসারের কাছে নিয়ে গেল। করমর্দনের জন্যে তিনি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

—আপনি নিশ্চয় মঁসিয়ে পিয়ের এ্যারোনাক্স? হেসে শুধোলেন তিনি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কম্যাণ্ডার ফ্যারাগুট?

—আমি আপনাকে জাহাজে স্বাগত জানাচ্ছি, করমর্দন করতে করতে ক্যাপ্টেন বললেন, চলুন, আপনাকে আপনার কেবিন দেখিয়ে দিই।

জাহাজটা ঘুরে দেখে মনে হল অ্যাব্রাহাম লিংকন ঠিক এই কাজের উপযুক্ত জাহাজ। সামুদ্রিক দানবকে ধরবার জন্যে জাহাজকে রণসাজে সাজানো হয়েছে। এর ইঞ্জিনগুলিও খুব শক্তিসম্পন্ন।

জাহাজের ভেতরের ব্যবস্থা ও আমার কেবিনটি দেখে ভাল লাগল। এখানে বেশ আরামে থাকতে পারব আমরা—তাই না? কনসীলকে জিগ্যেস করলুম আমি।

—হুজুরের যে জায়গা ভাল লাগবে তা আমার কাছে স্বর্গ, স্বভাব সুলভ বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল কনসীল।

জাহাজ যখন ছাড়ল তখন ব্রুকলীন বন্দর আর ঈস্ট রিভারের তীরবর্তী সমস্ত অঞ্চল লোকে-লোকারণ্য। জাহাজ হাডসন নদীর জলে গিয়ে পড়া পর্যন্ত হাজার হাজার লোকের কণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠল এবং রুমাল নেড়ে তারা এই জাহাজ এবং তার যাত্রীদের অভিনন্দন জানালো। প্রত্যুত্তরে 'আব্রাহাম লিংকন' থেকে তিনবার আমেরিকার জাতীয় পতাকা তুলে ধরা হল।

আস্তে আস্তে জাহাজের গতি বাড়ল। তারপর আটটার ঘণ্টা বাজার পর ফায়ার আইল্যাণ্ডকে পেছনে ফেলে আটলান্টিকের ঘন সবুজ জলরাশি ভেদ করে আব্রাহাম লিংকন এগিয়ে যেতে লাগল।

চার

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট ছিলেন একজন সুদক্ষ নাবিক। তাঁকে 'আব্রাহাম লিংকনের' দায়িত্ব দিয়ে কর্তৃপক্ষ যোগ্য লোককেই নির্বাচন করেছিলেন।

ফ্যারাগুট প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে এই সামুদ্রিক বিভীষিকাকে তিনি ধরবেনই।

ফ্যারাগুটের মত জাহাজের অন্য অফিসাররাও বিশ্বাস করতেন যে, সমুদ্রের কোন বিশাল জীবই এই অনিষ্ট করে বেড়াচ্ছে। দূরবীন দিয়ে সমুদ্র দেখতে দেখতে জন্তুটির সঙ্গে কখন কিভাবে দেখা হবে তা নিয়ে প্রায়ই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতেন। প্রাণীটিকে দেখবার আগ্রহ সবারই ছিল সমান।

এছাড়া প্রাণীটিকে খোঁজবার আরও একটা আকর্ষণ ছিল। ফ্যারাগুট ঘোষণা করেছিলেন যে, যে প্রথম প্রাণীটিকে দেখতে পাবে তাকে দু' হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। এই থেকে বোঝা যাবে জাহাজের ওপর থেকে কতগুলি চক্ষু দিবারাত্র সন্ধানী দৃষ্টি চালাতো সমুদ্রের ওপর।

অস্ত্রসজ্জার দিক থেকে আব্রাহাম লিংকনের কোন ত্রুটি ছিল না, তবে তার সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল হারপুন ছোঁড়ার অদ্বিতীয় বীর নেড ল্যাণ্ড।

নেড ল্যাণ্ডের বাড়ি কানাডায়। অত্যন্ত ক্ষিপ্র হাতে হারপুন ছুঁড়তে পারত সে। বুদ্ধিমান অথচ বেপরোয়া স্বভাবের নেড ল্যাণ্ডের হাত থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পালানো যে কোন তিমির পক্ষে ছিল অসম্ভব।

কানাডা আর ফ্রান্সের লোকেদের মধ্যে মিল থাকে। অচিরেই নেডের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেল। সে আমাকে মেরু অঞ্চল ও অন্যান্য দেশের রোমাঞ্চকর কাহিনী ও মাছ শিকারের গল্প বলত। অদ্ভুত বর্ণনাশক্তি ছিল এই হারপুন-বীরের। তার মুখে তার জীবনের বিচিত্র কাহিনী শুনতে শুনতে আমার মনে হত আমি যেন হোমারের মুখে ইলিয়াড শুনছি—এমনই নিখুঁত তার গল্প বলার ধরন।

সমুদ্রের বুকে সেই বিপদসঙ্কুল দিনগুলি কাটাতে কাটাতে নেডের সঙ্গে আমার সুনিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তার স্মৃতি আমার কাছে বড়ই সুখকর।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, এই অলৌকিক প্রাণীটি সম্বন্ধে নেডের মত কি ছিল। শুনলে অবাক হতে হয় যে জাহাজে আর সবার মধ্যে একমাত্র সে-ই এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত না এবং এ প্রসঙ্গ কেউ উত্থাপন করলে সে এর আলোচনা এড়িয়ে যেত।

একদিন জাহাজের পেছন দিকের পাটাতনে বসে আমি আর নেড গল্প করছিলুম। আমি নিজে থেকেই এই সামুদ্রিক রহস্যটির কথা তুললুম কিন্তু তবু নেড এ নিয়ে কোন মন্তব্য করছে না দেখে আমি সোজাসুজি তাকে একটা প্রশ্ন করে বসলুম, আচ্ছা নেড, তুমি এই প্রাণীটির অস্তিত্বে বিশ্বাস কর না কেন? এর কি কোন বিশেষ কারণ আছে?

—বোধ হয় আছে, নেড তার যা মুদ্রাদোষ কপালে করাঘাত করে বলল।

—কিন্তু নেড, তোমার পেশাই হচ্ছে তিমি শিকার করা। তুমি বেশ ভালভাবেই জান যে সমুদ্রে মৎস্য জাতীয় নানা রকমের জীব আছে। এই অবস্থায় তোমার পক্ষে একটা অতি বৃহৎ জীবের কল্পনা করাই তো স্বাভাবিক।

—ঠিক ওইখানে আপনি ভুল করছেন, নেড জবাব দিল। তিমি শিকারী হিসেবে আমি অনেক সামুদ্রিক প্রাণীকে তাড়া করে গিয়েছি। হারপুন দিয়ে ঘায়েলও করেছি অনেককে, কিন্তু তাদের দেহে যতই অস্ত্র থাকুক তা দিয়ে লোহার পাতে একটা আঁচড় কাটাও যে সম্ভব নয় তা আমি জানি।

দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আমি বললুম, কিন্তু নেড আমি স্তন্যপায়ী, মেরুদণ্ডী এক প্রাণীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি যার দেহের শক্তি অসীম। আমি আরও মনে করি যে, শত্রুকে আক্রমণের জন্যে এই প্রাণীর এমন একটা শির আছে, যার বিদ্ধ করবার শক্তি অসীম।

নেড মুখে বলল, 'হুম্', কিন্তু তার ভাব দেখে মনে হল না সে আমার কথা বিশ্বাস করেছে।

—আর একটা জিনিস ভেবে দেখ নেড, সেরকম কোন প্রাণী যদি

থেকেই থাকে আর তার বিচরণ স্থল যদি সমুদ্রের কয়েক মাইল নীচে হয়, তাহলে তার শারীরিক গঠন এমন হবে যার ফলে প্রাণীটি হবে অমোঘ শক্তির অধিকারী।

—এ রকমটা কেন হবে? প্রশ্ন করল নেড।

—তার কারণ সমুদ্রের নীচে জলের চাপ এত প্রবল যে খুব শক্তিশালী প্রাণী ছাড়া সেখানে কেউ টিঁকে থাকতে পারে না। একটা উদাহরণ দিই। বত্রিশ ফুট জলের নিচে তোমার মত একজন মানুষ ৯৭,৫০০ পাউণ্ড এবং ৩২,০০০ ফুট নিচে বইবে ৯৭,০০০,০০০ পাউণ্ড।

—বলেন কি? এই রকম ব্যাপার। নেড তাজ্জব বনে যায়।

—হ্যাঁ। এইবার কল্পনা কর কয়েক শ গজ লম্বা এবং সেই অনুপাতে তেমনি চওড়া একটা প্রাণী যখন জলের ওইরকম নিচে থাকে তখন সে কতটা চাপ সহ্য করে? এখন কল্পনা কর, যে প্রাণী এতখানি চাপ সহ্য করতে পারে তার শরীরের যন্ত্র কত সবল এবং সে কি অসীম শক্তি ধরে। আরও মনে কর, এই দৈত্যাকৃতি প্রাণীটি যদি একটা এক্সপ্রেস ট্রেনের মত তীব্র গতিতে এসে একটা জাহাজের গায়ে আঘাত করে তাহলে সে জাহাজের অবস্থাটা কী হতে পারে।

—তাই তো···চিন্তান্বিত মুখে বলে নেড। আমার মনে হয় সমুদ্রের তলায় যদি কোন প্রাণী থাকে তাহলে তার শক্তি ঠিক এইরকম হবে।

—আর যদি সেরকম কিছু না-ই হয় তাহলে হে হারপুন-বীর, আমি তাকে প্রশ্ন করি, স্কোশিয়ার এই দুর্ঘটনাটি ঘটল কি করে।

নেড কিছু না বলে অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ে।

পাঁচ

জুলাই মাসের সাত তারিখে 'আব্রাহাম লিংকন' প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়ল।

এইবার সমুদ্রের ওপর কড়া নজর রাখতে হবে। নাবিকরা বলাবলি করতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

বলা বাহুল্য গোড়া থেকেই নজর রাখতে কেউ কসুর করছিল না। দুশো ডলারের অঙ্কটা তো আর কম নয়।

অর্থের প্রতি আমার নিজের কোন আকর্ষণ ছিল না, কিন্তু তবু আমি খাওয়া আর ঘুমানোর সময়টুকু বাদে বাকি সময় রোদ বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করে জাহাজের ডেকে বসে থাকতুম। জাহাজের যেদিকেই আমি যাই না কেন আমার লক্ষ্য থাকত সমুদ্রের ওপর। যখনই জলের মধ্যে কোন তিমিকে ভেসে উঠতে দেখা যেত অমনি গোটা জাহাজে উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যেত।

নাবিক ও অফিসাররা কেবিন থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতেন। উত্তেজনার প্রাবল্যে সবাই তখন হাঁপাচ্ছে, সবার চোখ তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে জন্তুটা জলের মধ্যে নড়াচড়া করছে।

কিন্তু সব আশাই মিথ্যে প্রতিপন্ন হত। কাছে গিয়ে দেখা যেত সেটা একটা সাধারণ তিমি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তিন মাস ধরে—এই তিন মাসের প্রতিটি দিন অনন্তকাল বলে মনে হচ্ছিল—আব্রাহাম লিংকনের যাত্রা চরম উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই সময়ের মধ্যে জাহাজটা একবার এই পথ থেকে ওই পথে যেতে হঠাৎ কিছু দেখে গতি থামিয়ে জাপান ও আমেরিকার সমস্ত উপকূল চষে বেড়িয়েছে, আর ভেতরে ভেতরে তার যাত্রী ও নাবিকরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

মানুষের যা সাধ্য তা করা হয়েছে, কিন্তু নাবিকদের ধৈর্য বুঝি আর বাঁধ মানছে না। জাহাজের নাবিকরা তাদের অসন্তোষের কথা ক্যাপ্টেনকে জানাল। ফ্যারাগুট তাদের কাছে তিন দিনের সময় চাইলেন। তিন দিনের মধ্যে সমুদ্র-দানবটির দেখা না পেলে আব্রাহাম লিংকন ইউরোপীয় সাগরের পথে দেশে ফিরে যাবে।

দুদিন কেটে গেল, কিন্তু আমাদের আশা পূর্ণ হল না। জন্তুটিকে লোভ দেখিয়ে জলের ওপর টেনে আনার জন্যে নানা ফন্দী করা হতে

লাগল। শুয়োরের মাংসের বড় বড় টুকরো জলে ছড়িয়ে দেওয়া হল যাতে সে সেই লোভে দেখা দেয়, কিন্তু মাংসগুলো সবই হারিয়ে গেল হাঙরের পেটে। জাহাজের চারপাশে আঁকশি দিয়ে দেখা হতে লাগল জলের মধ্যে কোথাও তার সন্ধান মেলে কিনা। কিন্তু না, সবাইকে নিরাশ করে চৌঠা নভেম্বরের রাত্রিও এমনি করে কেটে গেল।

পরের দিন অর্থাৎ পাঁচই নভেম্বর বেলা বারোটার সময় ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটের ওই মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। বারোটার ঘণ্টা বাজলেই সত্যনিষ্ঠ ফ্যারাগুট প্রশান্ত মহাসাগর ছেড়ে ইউরোপের দিকে জাহাজ ফেরাবেন।

জাহাজের তখনকার অবস্থিতি ছিল ৩১°২৫´ অক্ষরেখা এবং ১৩৬°৪২´ পূর্ব দ্রাঘিমার ভিতরে; জাপানের দ্বীপপুঞ্জ সেখান থেকে ২০০ মাইলের মধ্যে। ঘড়িতে আটটা বাজল। ঘণ্টা পড়ল, বড় বড় মেঘ ঘিরে এল চাঁদের চারপাশে। সমুদ্র শান্ত, জাহাজের গতি অত্যন্ত মৃদু।

আমি সে সময় জাহাজের ডেক থেকে ঝুঁকে দেখছিলুম। কনসীল পাশেই দাঁড়িয়েছিল, তার দৃষ্টি ছিল সম্মুখে প্রসারিত। জাহাজের নাবিকরা আবছা অন্ধকারে ঢাকা দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়েছিল। অফিসাররা চোখে দূরবীন লাগিয়ে তখনও সমুদ্রের বুকে কি যেন দেখার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন। মেঘমুক্ত চাঁদের আলোয় সমুদ্র হয়ে উঠেছিল উদ্ভাসিত।

—কনসীল, প্রিয় ভৃত্যকে ডাক দিয়ে আমি বললুম, দুশো ডলার লাভের শেষ সুযোগ এখন আমাদের হাতে।

—যদি অনুমতি দেন তো বলি, কনসীল বলল, টাকার ওপর লোভ আমার কিছুমাত্র নেই। সরকার যদি হাজার ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করতেন তাহলেও আমার কিছু এসে যেত না।

—তুমি ঠিকই বলেছ কনসীল। এখন যেন সমস্ত ব্যাপারটাই ছেলেমানুষীর মত ঠেকছে। যাক, আমার এইটে ভাবতেই ভাল লাগছে যে, আর ছ' মাসের মধ্যেই আমরা ফ্রান্সে ফিরে যাচ্ছি।

কনসীলের অমনি বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। ভাবের ঘোরে সে বলল, আমার মনে পড়ছে আপনার সেই সংগ্রহশালাটির কথা। বাড়িতে থাকলে আমি আপনার সংগৃহীত জীবাশ্মগুলি ঠিক গুছিয়ে রাখতুম। আর কত গণ্যমান্য মানুষ আসতেন আপনার ওই ছোট বাড়িটায়।

—সত্যি, ভাবতেও ভাল লাগে।···আমার কি মনে হয় জানো কনসীল, দেশে ফিরলে আমাদের এই পাগলামির জন্যে লোকে আমাদের খুব ঠাট্টা করবে।

—হ্যাঁ, সে কথা বেশ হলফ করেই বলা যায়···

কনসীল তার কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই সমস্ত নীরবতা ও প্রশান্তি ছিন্নভিন্ন করে নেড ল্যাণ্ডের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'চেয়ে দেখ'—ওই সেই, যার খোঁজে আমরা এতদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি।'

ছয়

নেডের এই চীৎকার শুনে জাহাজের ক্যাপ্টেন, অফিসার, নাবিক মায় ইঞ্জিনীয়ার ও স্ট্রোকাররা পর্যন্ত নিজের নিজের জায়গা ছেড়ে তার দিকে ছুটে গেল।

চতুর্দিকে এমন গাঢ় অন্ধকার যে আমার সন্দেহ হল নেড ল্যাণ্ড জন্তুটিকে দেখতে পেয়েছে কি না।

কিন্তু না, নেডের চোখ ভুল করে নি। একটু পরেই সে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে আমরা দেখলুম জাহাজের দু রশি পরিমাণ দূরে সমুদ্রের খানিকটা অংশ কি রকম একটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ আলো ফসফরাসের আলো বলে বোধ হয় না। অতিকায় দানবটি একবার জলের তলা থেকে ওপরে ভেসে উঠল এবং তার দেহ সেই আলো বিকীরণ করে আবার তলিয়ে গেল।

একজন অফিসার তাই দেখে বললেন, এটা শুধু সমুদ্রের জলের ফসফরাসগুলি দানা বেঁধে যে আলো হয় সেই আলো।

আমি প্রতিবাদ করলুম, না, সমুদ্রের জলে যে ফসফরাস আছে তার আলো কখনই এত উজ্জ্বল হতে পারে না। এই আলো, এটা বৈদ্যুতিক আলো, তাছাড়া দেখুন জিনিসটা নড়ছে। দেখুন—দেখুন এখন আবার আমাদের দিকেই আসছে।

আমার সঙ্গে সঙ্গে আরও সকলে দেখল যে, অলৌকিক প্রাণীটি দ্বিগুণ বেগে ছুটে আসছে জাহাজের দিকে।

জাহাজকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরতে লাগল সেটা। তারপর চলে গেল দু-তিন মাইল দূরে। আবার হঠাৎ দূরে একটা ফসফরাসের আবর্ত —জন্তুটাকে আমাদের জাহাজের অপর দিকে দেখা গেল। মনে হল যেন সে জাহাজের তলা দিয়ে ডুব-সাঁতার কেটে ওইদিকে পৌঁছেছে। যে কোন মুহূর্তে একটা প্রাণঘাতী সংঘর্ষ ঘটতে পারে, কিন্তু লক্ষ্য করলুম আমাদের জাহাজ প্রাণীটির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছে না, শুধু ধীরে ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছে জলের ওপর।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট এমনিতে খুব ধীর স্বভাবের লোক কিন্তু এখন যেন তাঁকে একটু বিচলিত দেখা গেল।

মিস্টার এ্যারোনাক্স, তিনি আমায় ডেকে বললেন, 'এ যে কি ধরনের প্রাণী তা বোধগম্য হচ্ছে না। আমার মনে হয় সকাল না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চুপচাপ থাকাই ভাল।

—ওটা যে একটা দাঁতাল তিমি এ বিষয়ে নিশ্চয় আপনার কোন সন্দেহ নেই তাই না?

—না। ওটা যে একটা অতিকায় দাঁতাল তিমি এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

—আমার মনে হয় এমন একটা প্রাণীর মুখোমুখী হতে গেলে সঙ্গে টর্পেডো থাকা চাই।

—ঠিকই বলেছেন, বললেন ক্যাপ্টেন। আমরা যে রকম কল্পনা করছি তা যদি ঠিক হয় তবে ওটা হবে পৃথিবীর সবচেয়ে সাংঘাতিক প্রাণী। এটা জানবার পর তো আমি আর ওটাকে নিয়ে ছেলেখেলা করতে পারি না।

সারা রাত একটি প্রাণীও দু চোখের পাতা এক করতে পারল না। সবারই মনে কী হয় কী হয় ভাব। জাহাজের গতি এখন অনেক কমিয়ে দেওয়া হল। দাঁতাল তিমিটাও জলের ওপর মন্থর গতিতে ভাসছিল। রাত একটা বাজতে সাত মিনিট, ঠিক সেই সময় হুইসলের একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ শোনা গেল।

—নেড ল্যাণ্ড, ক্যাপ্টেন গম্ভীর মুখে বললেন, তিমির গর্জন তো শুনেছ?

—অনেকবার, নেড উত্তর দিল, কিন্তু এরকম আওয়াজ কখনও শুনিনি। আহা, ওকে যদি হারপুনের নাগালে পেতুম।

রাত প্রায় দুটোর সময় আবার সেই উজ্জ্বল আলো আমরা দেখতে পেলুম। জাহাজ থেকে জন্তুটা যে কত দূরে তা বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু ওর ল্যাজের ঝাপটা আর নিশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল স্পষ্ট। মনে হল প্রাণীটা শ্বাস নেবার জন্যে জলের ওপর ভেসে উঠেছে আর প্রবল শব্দে তার ফুসফুসে বাতাস ভরে নিচ্ছে।

দিনের আলো ফুটতে প্রাণীটার সঙ্গে লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হল। মাছ ধরার বিরাট জালগুলি জলে নামানো হল। জাহাজের সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট হারপুন ছোঁড়ার বন্দুকগুলি প্রস্তুত করলেন। এ ছাড়া লম্বা লম্বা গাদা বন্দুকগুলি সাজানো হল। নেড ল্যাণ্ড নিজে তার সাংঘাতিক হারপুনের ফলাটাকে আরও ধারালো করতে লাগল।

কিন্তু এত আয়োজন সব বিফলে যাবার যোগাড় হল। সকাল সাতটা নাগাদ সমুদ্রের ওপর এত ঘন কুয়াশা জমল যে আমাদের দৃষ্টি তাতে আচ্ছন্ন হয়ে রইল। আটটা থেকে কুয়াশা কাটতে লাগল। দিগন্তরেখা স্পষ্ট হল ধীরে ধীরে। হঠাৎ ঠিক আগের দিনের মত নেড ল্যাণ্ডের গলা শোনা গেল। ওই যে চেয়ে দেখ সবাই, ওই যে সে।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই সেদিকে তাকাল। দেখা গেল আমাদের যুদ্ধ জাহাজের প্রায় দেড় মাইল দূরে সেই প্রাণীটা ভাসছে। সজোরে ও জলের ওপর আঘাত করছে এবং ফলে ঘূর্ণির সৃষ্টি হচ্ছে। কোন

জলজন্তুর ল্যাজের আঘাতের ফলে সমুদ্রের জলে যে এমন প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি হতে পারে তা আমি এই প্রথম দেখলুম।

জাহাজের নাবিক এবং অন্য অফিসাররা ক্যাপ্টেনের আদেশের অপেক্ষায় ছিলেন। ক্যাপ্টেন এতক্ষণ জন্তুটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। এইবার তিনি ইঞ্জিনীয়ারকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, আপনার বয়লারে বাষ্প যথেষ্ট আছে তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। উত্তর দিলেন ইঞ্জিনীয়ার।

—বেশ। আগুন জ্বালুন, সমস্ত বাষ্পশক্তি দিয়ে জাহাজ চালিয়ে যান।

ক্যাপ্টেনের এই আদেশে জাহাজের বুকে হর্ষধ্বনি উঠল। এইবার শুরু হবে লড়াই। দুটি চোঙা দিয়ে ধূম উদ্গিরণ করতে করতে আব্রাহাম লিংকন এগিয়ে গেল। প্রাণীটি প্রথমে স্থির হয়ে ছিল। জাহাজ আরও এগোতে একটুখানি ঘুরে খানিক দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে প্রাণীটা আব্রাহাম লিংকন এই সামুদ্রিক দানবটির পিছু ধাওয়া করে ছুটল। কিন্তু কিছুতেই তফাৎটা দুশো গজের ভেতর আনতে পারা গেল না। মনে হল, এইভাবে কিছুতেই ওকে নাগালের মধ্যে পাওয়া যাবে না। তখন ক্যাপ্টেন নেড ল্যাণ্ডকে ডেকে পাঠালেন এবং এই অবস্থায় জাহাজ থেকে নৌকো নামিয়ে প্রাণীটির কাছে যাওয়া যায় কিনা সে সম্বন্ধে তাঁর মত জানতে চাইলেন।

—আজ্ঞে না, নেড শুনেই মাথা নাড়ল, দেখেই বোঝা যাচ্ছে ওকে বশে আনা সহজ কথা নয়। সুতরাং এতখানি ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।

—তাহলে কি করা যাবে? জিগ্যেস করলেন ক্যাপ্টেন।

—জাহাজের গতি আরও বাড়িয়ে দিন। পরামর্শ দিল নেড ল্যাণ্ড। তারপর যদি আপনি অনুমতি করেন তাহলে জাহাজের খুঁটির নিচে দাঁড়িয়ে দেখি ওকে আমার হারপুনের নাগালের মধ্যে পাওয়া যায় কি না।

ক্যাপ্টেন একথা শুনে খুশি হলেন। বললেন, বেশ। তাই হবে

নেড। তখনই ইঞ্জিনীয়ারকে ডেকে তিনি জাহাজের গতি বাড়িয়ে দিতে বললেন। নেড তার জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়ালো, আব্রাহাম লিংকনের গতি তখন ঘণ্টায় আঠারো মাইলের ওপর।

কিন্তু কী আশ্চর্য, প্রায় এক ঘণ্টা ধরে আমাদের জাহাজ সেই অভিশপ্ত প্রাণীটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছুতেই তার নাগাল পেল না।

আরও গতি বাড়ানো হল। আরও জ্বালানী কাঠ চাপানো হল কিন্তু জন্তুটাও সমানে জাহাজের গতিকে ছাড়িয়ে চলতে লাগল।

নেড তার জায়গায় সজাগ প্রহরীর মত হারপুন হাতে দাঁড়িয়ে আছে। যখনই জাহাজ দানবটির কাছে আসে তখনই নেড তার হারপুন ছুঁড়তে যায় আর আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জন্তুটা তার জায়গা থেকে এগিয়ে যায়।

—দেখছি দৌড়ের পাল্লায় ওকে হারানো যাবে না। বেগতিক দেখে ক্যাপ্টেন বললেন, দেখা যাক কামানের গোলা দেগে ওকে ঢিট করা যায় কি না। এই বলে তিনি কামান দাগবার হুকুম দিলেন। তখুনি জাহাজের কামানে গোলা ভরা হল এবং কামান ঘুরিয়ে প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে কামান দাগা হল। কিন্তু কোন কাজ হল না। প্রাণীটার কয়েক ফুট ওপর দিয়ে গোলা বেরিয়ে গেল।

—ডান দিক ঘেঁষে মারো, ক্যাপ্টেন চীৎকার করে বললেন, যে ঘায়েল করতে পারবে পাঁচ ডলার পুরস্কার পাবে সে।

একজন বৃদ্ধ গোলন্দাজ অনেকক্ষণ ধরে টিপ করে একটা গোলা নিক্ষেপ করল। নাবিকরা চীৎকার দিয়ে উঠল, 'টিপ ঠিক হয়েছে।'

কিন্তু দেখা গেল গোলা দানবটাকে আঘাত করলেও সেটা আগের মতই ছুটে চলেছে। দাঁতে দাঁত চেপে ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমার জাহাজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ওকে ছাড়ব না।'

আমি ভাবলুম ক্যাপ্টেনের বোধ হয় জিত হবে। পরিশ্রমের ফলে ক্লান্ত হয়ে গিয়ে প্রাণীটা হয়ত ধরা দেবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতেও ওর ক্লান্তির কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

আস্তে আস্তে রাত্রি তার কৃষ্ণ যবনিকা টেনে দিল সমুদ্রের ওপর।

আমি মনে করেছিলুম জন্তুটার বোধ হয় আর দেখা পাওয়া যাবে না, আমাদের অভিযানের বোধ হয় এইখানেই ইতি হবে। কিন্তু আমি ভুল বুঝেছিলুম। ঠিক এগারোটার সময় সেই উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো আবার দেখা গেল। ঠিক আগের রাত্রির মতই জ্বলছে তা।

দাঁতাল তিমিটাকে দেখতে পাচ্ছি আমরা। আপাতত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সে। বোধহয় সারাদিনের ছুটোছুটির পর সে এখন ক্লান্ত। এই তো তাকে মারবার সুযোগ উপস্থিত। আর ক্যাপ্টেনও সে সুযোগ কাজে লাগাতে চাইলেন।

অত্যন্ত সন্তর্পণে এগুতে লাগল অ্যাব্রাহাম লিংকন। নেড আবার হারপুন নিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে তার আগের জায়গায়।

আমাদের জাহাজ নিঃশব্দে এগিয়ে ওই প্রাণীর দু রশি পরিমাণ দূরে গিয়ে দাঁড়াল। জাহাজে একটা অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। আমরা তখন সেই উজ্জ্বল আলোকচ্ছটার একশো ফুটেরও কম দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছি।

নেডের হারপুন থেকে প্রাণীটার দূরত্ব তখন মাত্র কুড়ি ফুটের মত। প্রাণীটা তখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অকস্মাৎ আমি দেখলুম নেড সামনে হাত বাড়িয়ে দিল এবং সজোরে হারপুন নিক্ষেপ করল।

হারপুনের শব্দ শুনে মনে হল তা কোন কঠিন বস্তুকে আঘাত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই বৈদ্যুতিক আলোটা নিভে গেল এবং দুটি বিশাল জলস্তম্ভ জাহাজের ওপর ভেঙে পড়ল। সে জলের তোড় এত প্রবল যে জাহাজের লোকজন এদিক ওদিক ছিটকে পড়ল, মাস্তুলের দড়িদড়া গেল ছিঁড়ে। জলের বেগ বাড়তে লাগল এবং এক প্রচণ্ড আঘাতে বেসামাল হয়ে আমি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হলুম।

সাত

এমন আচমকা আমি জলের মধ্যে গিয়ে পড়লুম যে কয়েক মুহূর্ত আমার কোন জ্ঞান ছিল না। ভাগ্যক্রমে আমার সাঁতার ভালই জানা ছিল, তাই আমি আবার ভেসে উঠতে পারলুম।

আমার প্রথম দুশ্চিন্তাটা হল জাহাজটা খোঁজা। একসঙ্গে অগুনতি প্রশ্ন ভিড় করে এল আমার মনে। জাহাজের নাবিকরা কি আমায় পড়ে যেতে দেখেছে? অ্যাব্রাহাম লিংকন কি মোড় ঘুরে চলে গেছে? ক্যাপ্টেন কি আমার জন্যে নৌকো পাঠাবেন? আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আমার বাঁচার কি কোন আশা আছে?

ভিজে জবজবে পোশাকে ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আমি জলের নিচে তলিয়ে যাচ্ছিলুম। কে আছ বাঁচাও—শেষ বারের মত আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

হঠাৎ কে যেন আমার জামা টেনে ধরেছে বুঝতে পারলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে কানে এল কনসীলের গলা, হুজুর যদি আমার কাঁধে ভর দেন তাহলে বেশ সহজে সাঁতার কাটতে পারবেন।

—কনসীল তুমি? আমি এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরলুম। তুমিও কি আমার মত ওই ধাক্কায় জলে পড়ে গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আর আমাদের জাহাজ?

—আমাদের জাহাজের কথা আর না তোলাই ভাল। ওই দানবটা বোধ হয় তার আর কিছু বাকি রাখেনি।

শুনে আমি খুব হতাশ হয়ে পড়লুম। এই নিঃসীম সমুদ্রে আমরা তাহলে একান্তই সঙ্গীহারা।

সেই অনন্ত সমুদ্রের মধ্যে কুটোর মত ভাসতে ভাসতে আমি ভাবলুম যে আমাদের বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে, যদি 'অ্যাব্রাহাম

লিংকনে'র কোন বোট আমাদের দেখতে পেয়ে তুলে নেয়। সেইজন্যে আমাদের উচিত যতক্ষণ সম্ভব ভেসে থাকার চেষ্টা করা।

রাত একটা নাগাদ আমি ভীষণ পরিশ্রান্ত বোধ করলুম। আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যথায় অবশ হয়ে এল। কনসীলও আর আমার ভার সহ্য করতে পারছিল না।

—আমায় ছেড়ে দাও কনসীল, আমি ওকে বললুম, তুমি নিজে বাঁচার চেষ্টা কর।

—আমি মনিবকে ছেড়ে দেব, কনসীল বলল, কখনই নয়।

এই সময় মেঘের আড়ালে চাঁদ দেখা গেল এবং সেই আলোয় আমি আমাদের যুদ্ধ জাহাজটিকে দেখতে পেলুম। আমাদের কাছ থেকে তার দূরত্ব হবে প্রায় পাঁচ মাইলের মত।

আমার ইচ্ছে হল চীৎকার করে ওদের ডাকি, কিন্তু এতদূর থেকে ডেকেই বা কি লাভ! কনসীল শুধু মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছিল 'বাঁচাও বাঁচাও'!

হঠাৎ মনে হল কনসীলের ডাকে কে যেন সাড়া দিল।

—শুনছ কনসীল?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

মরীয়া হয়ে কনসীল আরও একবার ডাক দিল।

আবারও সেই ডাক শুনলাম। না, এবার আর ভুল নয়। তবে কি 'অ্যাব্রাহাম লিংকনে'র' আরও কোন হতভাগ্য আমাদের খুব কাছে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে!

হঠাৎ সেই অবস্থাতে কি একটা শক্ত জিনিসের স্পর্শ পেলুম। আর তারপরেই বুঝতে পারলুম যে আমাকে টেনে উপরে তুলে কিসের ওপর শুইয়ে দেওয়া হল। এর পরেই আমি জ্ঞান হারালুম।

ঠিক সেই চাঁদের ক্ষীণ রশ্মিতে আমি আমার চোখের সামনে একটি মুখ দেখতে পেলুম। সে মুখ কনসীলের নয়। কিন্তু সে মুখ আমার চেনা।

—একি, নেড! চেঁচিয়ে উঠলুম আমি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নেড উত্তর দিল।

—তুমিও কি আমাদের মত জাহাজ থেকে পড়ে গিয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আমার কপালটা আপনাদের চেয়ে কিছুটা ভাল। কেন না আমি জলে না পড়ে, পড়েছিলুম একটা দ্বীপের ওপর।

—দ্বীপ? বলছ কি?

—দ্বীপ না বলে বলা উচিত, সেই অতিকায় তিমিটার ওপর।

—কী বলছ নেড, আমি কিছুই বুঝছি না।

—বলব কি প্রফেসার, আমার হারপুনটা ছোঁড়ার পর সেটা পরীক্ষা করে দেখলুম যে সেটা ভোঁতা হয়ে গেছে।

—সে কি! তা কি করে হল? বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলুম আমি।

—কেন জানেন প্রফেসর? নেড বলল, যে প্রাণীটিকে লক্ষ্য করে আমি হারপুনটি ছুঁড়েছিলুম তার সমস্ত গাটা লোহার চাদর দিয়ে মোড়া।

নেডের শেষ কথাগুলি বিদ্যুতের মত আমার মাথার ভেতর খেলে গেল। তক্ষুণি আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম। পরে দেখতে পেলুম, যে বস্তুটির ওপর আমরা ভর করে বসে আছি সেটি জলের থেকে আধখানা ওপরে বেরিয়ে আছে। তার ওপর পা দিয়ে আঘাত করে আমি আরও অবাক হলুম কেন না কোন সামুদ্রিক জীবের দেহই এইরকম কঠিন ও দুর্ভেদ্য বস্তু দিয়ে তৈরি হয় না। এইরকম দেহ দেখে আমার মনে এই ধারণা হল যে এটি সরীসৃপ জাতীয় কোন বিশাল প্রাণী হবে। কিন্তু না। পরক্ষণে আমার মনে হল সরীসৃপ বা গিরগিটিদের বহির্ভাগ তো এমন মসৃণ ও সমান হয় না। আমি যে আঘাত করেছিলুম ওর পিঠে, তাতে একটা ধাতব আওয়াজ হয়েছিল।

আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম যে, যে প্রাণীটি সমস্ত পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজকে বিস্ময়াভিভূত এবং সমুদ্রচারী সব নাবিকদের হতবুদ্ধি করেছে সেটা কোন প্রাকৃতিক প্রাণী নয়, মানুষের সৃষ্ট অদ্ভুত কিছু।

হঠাৎ প্রাণীটির পেছন দিকে জলের বুড়বুড় শব্দ শোনা গেল ও পরক্ষণেই সে চলতে শুরু করল। তার পিঠটা শক্ত করে ধরে আমরা

টাল সামলালুম। আমাদের কপাল জোরে তার গতি তখন বেশ মন্থরই ছিল।

—যতক্ষণ এটা জলের ওপর ভাসবে ততক্ষণই বাঁচোয়া। কিন্তু একবার জলের নিচে ডুব দিলেই গেছি আর কি। বিড়বিড় করে বলল নেড।

রাত যত গভীর হতে লাগল ততই এই অদ্ভুত জন্তুটি নিয়ে নানা চিন্তা আসতে লাগল আমার মাথায়। আস্তে আস্তে দিনের আলো ফুটল। কুয়াশা কেটে যাওয়ায় এর গড়নটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল আমার চোখে। হঠাৎ বুঝতে পারলুম আস্তে আস্তে সেটা জলের তলায় ডুবতে আরম্ভ করছে।

এই দেখে নেডের মাথা গরম হয়ে গেল। 'থামো' পা দিয়ে সজোরে তার বাহনের পিঠে এক লাথি কষিয়ে দিয়ে বলল সে।

এই আঘাতের ফলে আর কিছু না হোক তার জলে ডোবাটা বন্ধ হয়ে গেল। ভেতরে কিসের একটা জোর শব্দ শোনা গেল। তারপরেই লোহার ঢাকনি খুলে বেরিয়ে এল একটা লোক। আমাদের দেখতে পেয়েই একটা অস্ফুট চীৎকার করে পরক্ষণে চলে গেল সে ভেতরে।

এর কয়েক মুহূর্ত পরে মুখোশ পরা আটদশজন শক্ত সমর্থ লোক ভেতর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে আমাদের বন্দী করে নিয়ে গেল ভেতরে।

আট

এত তাড়াতাড়ি আমাদের এইভাবে বন্দী করে নিয়ে আসা হল যে আমরা হতবাক হয়ে রইলুম। যাদের হাতে আমরা পড়েছি এরা এক নতুন ধরনের জলদস্যু ভাবলুম আমি।

নেড ল্যাণ্ডের মাথা আগে থেকেই গরম ছিল। একটা অন্ধকার ঘরে আমাদের ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করা মাত্র সে চেঁচিয়ে বলল,

শয়তানরা নিপাত যাক। এ যে দেখছি আস্ত নরখাদকদের হাতে পড়লাম আমরা। কী ভেবেছে এরা আমাদের।

—নেড আস্তে ভাই, কনসীল বলল, ধৈর্য হারিও না।

হাতড়ে হাতড়ে আমি বুঝতে চেষ্টা করলুম আমরা কোথায় আছি। কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। নেডের মত ঢ্যাঙা লোকও বুঝতে পারল না ঘরটা কত উঁচু। হঠাৎ অন্ধকারের ভেতর এক ঝলক আলো ছিটকে পড়ল।

তারপর দরজার হাতল খোলার শব্দ শোনা গেল। তাকিয়ে দেখলুম দুজন লোক ভেতরে প্রবেশ করছে। দুজনের মধ্যে যে গড়নে লম্বা সম্ভবত সেই সর্দার। আমাদের বেশ ভাল করে দেখল তারপর তার সঙ্গীকে আমাদের দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলল।

তার সঙ্গী দু'একটি কথা বলে ও মাথা নেড়ে জবাব দিল। তারপর আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল।

আমি আদ্যোপান্ত আমাদের কাহিনী বিশুদ্ধ ফরাসীতে ও কনসীল তার যথাসাধ্য এ্যাংলো-স্যাক্সন ভাষায় সব ঘটনা বলল।

কিন্তু তার কিছু এরা বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না। এরপর কনসীল জার্মান ভাষায় এবং আমি ল্যাটিনে আমাদের বক্তব্য পেশ করলুম। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। আগন্তুক দুজন নিজেদের মধ্যে কি সব কথা বলে দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেল।

—কী অনাসৃষ্টি কাণ্ড, নেড সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠল, এতগুলো ভাষায় কথা বলা হল, শয়তানগুলো তার একটা জবাব পর্যন্ত দিলে না।

—নেড, শান্ত হও, দুর্ধর্ষ হারপুন বীরকে উদ্দেশ করে আমি বললুম, রাগলে কোন লাভ হবে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত এই ডুবো-জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করছি আমি, ততক্ষণ আমাদের সবাইকে ধৈর্য ধরতেই হবে। আগে আমাদের জানা দরকার এরা কি ধরনের লোক।

—তা আর আমার জানতে বাকি নেই, নেড গজগজ করতে লাগল, এরা পাজির পা-ঝাড়া।

এরপর কনসীল কি একটা বলতে গেছে এমন সময় দরজা ঠেলে একজন পরিচারক ভেতরে ঢুকল। তার হাতে আমাদের জন্যে জামা-কাপড়। আমরা তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে নিলুম। এরপর লোকটি টেবিলের ওপর প্লেট সাজিয়ে দিল। খাবার বাসন, কাঁটা-চামচ পরিষ্কার ঝকঝক করছে। সমস্ত কাঁটা চামচ ও প্লেটের ওপর এই কথাগুলি খোদাই করা রয়েছে দেখলুম, 'মোবিলিস ইন মোবিলি এন'।

আমাদের পরিবেশন করা হল বেশ কয়েক জাতের মাছ। অন্য সব ভাবনা ছেড়ে আমরা গোগ্রাসে গিলতে লাগলুম।

খাওয়ার পর বেজায় ঘুম পেল। আমরা তিনজনেই দারুণ ক্লান্ত। 'ঘুমটা বেশ জব্বর হবে বলে মনে হচ্ছে,' বলল কনসীল।

—সে আর বলতে, জবাব দিল নেড।

ওরা দুজন কেবিনের মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে তখনই গড়িয়ে পড়ল। আমি ঠিক তক্ষুণি ঘুমোতে পারলুম না। হাজারো চিন্তা আমার মাথায় জট পাকাচ্ছিল। আমরা কোথায়? এ কাদের হাতে পড়লুম আমরা। এই সব ভাবনা আমার মস্তিষ্ক গরম করে তুলল। আমার মনে হল যে ডুবোজাহাজটিতে আমরা এখন অবস্থান করছি তা যেন আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়। অদ্ভুত এক আতঙ্কে শিউরে উঠল আমার সারা দেহ। হাজার হাজার সামুদ্রিক প্রাণী আমি দেখতে পেলুম। তাদের চেহারাও অনেকটা এই প্রাণীটির মত মনে হল।

এই রকম ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তে কখন এক সময় ঘুম নেমে এল আমার চোখে।

নয়

কতক্ষণ ধরে যে আমরা ঘুমিয়েছিলুম তা বলতে পারব না। তবে ঘুম থেকে যখন উঠলুম, দেখলুম আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে।

নেড আর কনসীল তখনও ঘুমোচ্ছিল। আমি একমনে ডুবো-

জাহাজটার কথা ভাবছিলুম। এই ডুবোজাহাজটি কি ভাবে চালিত হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় অক্সিজেনই বা সংগ্রহ করছে কি করে। তবে কি সেই কারণেই বড় বড় মাছেদের মত ডুবোজাহাজটিকে মাঝে মাঝে জলের ওপর ভেসে উঠতে হয়।

এই সময় নেড আর কনসীলের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ কচলে উঠে বসল তারা বিছানার ওপর।

—হুজুরের ভাল ঘুম হয়েছিল তো?

—হ্যাঁ, কনসীল। খুব ভাল ঘুম হয়েছে। তোমার নেড? আমি নেডকে জিগ্যেস করলুম।

—ওঃ সে আর বলতে। ঠেসে ঘুমিয়েছি। কিন্তু প্রফেসর, এ যে সমুদ্রের হাওয়া বইছে বলে মনে হচ্ছে।

—তোমার অনুমান ঠিক। এইভাবে বাতাস গ্রহণ করার আওয়াজকেই আমরা দাঁতাল তিমির ফুসফুসের শব্দ বলে ভুল করতুম।

আমরা যে পুরো একটা দিন ঘুমিয়েছি সে খেয়াল আমাদের ছিল না। তিনজনেরই খিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। নেড ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠছিল। নেড তাকে বোঝাতে চাইছিল যে আমরা যখন এই ডুবো-জাহাজের অতিথি তখন আমাদের উচিত এদের সব নিয়ম মেনে চলা।

এরপর অনেকক্ষণ কেটে গেল তবু পরিচারকটির দেখা পাওয়া গেল না। এদিকে খিদের জ্বালায় আমাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠছিল। নেড ক্ষেপে উঠছিল সবচেয়ে বেশী। তার যে রকম রগচটা স্বভাব তাতে জাহাজের কাউকে সে এখন হাতের কাছে পেলে যে কী করবে সেই ভেবে আমার দুশ্চিন্তা হল।

ঠিক সেই সময় দরজার তালা খুলে ভেতরে ঢুকল পরিচারকটি। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে নেড তার টুঁটি টিপে ধরল। বজ্রমুষ্টির চাপে লোকটি কোঁকাতে লাগল।

কনসীল ছুটে গিয়ে নেডের হাত থেকে পরিচারকটিকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিল। আমিও তার দিকে ছুটে যাচ্ছিলুম। ঠিক সেই সময় দৈববাণীর মত ফরাসী ভাষায় এই কথাগুলি শুনে থমকে দাঁড়াতে হল।

'শান্ত হও নেড ল্যাণ্ড। আর দয়া করে আমার কথায় একটু কান দেবেন কি, প্রফেসর এ্যারোনাক্স ?'

দশ

যিনি এই কথাগুলি বললেন তিনি এই জাহাজের ক্যাপ্টেন।

নেড তাঁর হুকুম শোনামাত্র পরিচারকটিকে ছেড়ে দিয়ে দাঁড়াল আর সে-ও প্রভুর ইঙ্গিত পেয়ে চকিতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ক্যাপ্টেনের মুখে অবিচলিত গাম্ভীর্য।

কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে দিয়ে কাটল। তারপর ক্যাপ্টেন শান্ত স্বরে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আমি ফরাসী, ইংরেজী, জার্মান এবং ল্যাটিন এই চারটে ভাষাই জানি। সুতরাং বুঝতে পারছেন প্রথম সুযোগেই আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে পারতুম। কিন্তু তা করিনি, কেন না আমার ইচ্ছে ছিল আপনাদের ভালভাবে জানার।...আপনাদের পরিচয় আমি জানি,' ক্যাপ্টেন আমাদের এক একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'আপনাদের একজন প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক এ্যারোনাক্স আর একজন তাঁর ভৃত্য কনসীল এবং তৃতীয় জন হারপুনবীর নেড ল্যাণ্ড।'

একটুক্ষণ বিরতির পর তিনি আবার শুরু করলেন 'আপনারা নিশ্চয় আমার এত বিলম্বে আপনাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। এর কারণ হল, আপনাদের প্রতি কি রকম ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে আমি খুব নিশ্চিত ছিলুম না।' ক্যাপ্টেন একটু থেমে ফের বললেন। 'মানব সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আমি নিরালায় বাস করছিলুম। আপনারা আমার সেই নির্জন বাসকে বিঘ্নিত করে আমার জীবনে বিপর্যয়—'

—কিন্তু সেটা নিতান্তই অনিচ্ছাকৃত, আমি তাঁর কথার মাঝখানে বাধা দিলুম।

—অনিচ্ছাকৃত, তিনি তাঁর গলা সামান্য চড়িয়ে বললেন, 'আপনি কি বলতে চান যে অ্যাব্রাহাম লিংকন যে সমুদ্রময় আমার পিছু ধাওয়া করে ছুটছিল তা অনিচ্ছাকৃত ? আপনি কি বলতে চান যে আপনাদের নিক্ষিপ্ত গোলা আমার ডুবোজাহাজকে অনিচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করেছে ? নেড ল্যাণ্ড যে হারপুন ছুঁড়ে আমার জাহাজকে আঘাত করেছে তা কি না জেনেই ?'

আমি লক্ষ্য করলুম যে ওঁর কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন বিরক্তির ইঙ্গিত রয়েছে। ডুবোজাহাজ সম্পর্কে প্রথমে আমরা যে রকম ভেবেছিলুম সেটা তাঁকে জানানোর জন্যে বললুম, 'দেখুন, আপনার এই ডুবোজাহাজটি নিয়ে ইউরোপ আমেরিকায় যে কি পরিমাণ বিতর্ক হয়েছে তা বোধ হয় আপনি জানেন না। আপনাকে শুধু আমি এইটুকু জানাতে পারি যে প্রশান্ত মহাসাগরে আপনার ডুবোজাহাজকে ধাওয়া করে যাওয়ার সময় আমাদের সকলের এই ধারণাই ছিল যে তারা এক অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণীকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

ক্যাপ্টেনের ঠোঁটের ওপর একটি মৃদু হাসি খেলে গেল। শান্ত গলায় তিনি বললেন, 'মিস্টার এ্যারোনাক্স আপনি কি বলতে চান যে, আমার যানটি ডুবোজাহাজই কোন সামুদ্রিক জীব নয়, এ কথা জানলে আপনারা আমায় ছেড়ে দিতেন ?'

আমি এবার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইলুম।

—আপনাদের প্রতি কোনরকম সৌজন্য দেখাতে আমি বাধ্য নই। আপনাদের নিয়ে আমি যা খুশী তাই করতে পারি। আপনাদের জলের তলায় ডুবিয়ে পৃথিবীর বুক থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারি। মনে রাখবেন।

—তা পারেন। আমি বললুম, তবে সেটা কোন সভ্য মানুষের কাজ হবে না।

—প্রফেসর। ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সভ্য মানুষ বলতে

আপনি যা বোঝেন আমি তা নই। মানুষের তৈরি সমাজের সঙ্গে বিশেষ কোন কারণে আমি সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। তাই তার নিয়মগুলো মানতে আমি বাধ্য নই। এই ব্যাপারে ভবিষ্যতে কোন কথা তুলতে আপনাকে আমি নিষেধ করে দিচ্ছি।'

এই কথাগুলি বলতে বলতে তাঁর চোখে এমন ক্রোধ ও ঘৃণা ফুটে উঠল যে তা থেকে খানিক আন্দাজ করতে পারলুম ভদ্রলোকের অতীত জীবন কেমন ছিল। তিনি যে সমাজ থেকে শুধু নিজেকে পৃথক করে নিয়েছেন তা-ই নয়, এই সমুদ্রে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠা বিস্তার করেছেন।

—মানুষের প্রতি দয়া দেখানো প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্যাপ্টেন বললেন, সেই কথা বিবেচনা করে আমি স্থির করেছি যে ভাগ্যচক্রে যখন আপনারা আমার জাহাজে এসেই পড়েছেন, তখন আপনারা আমার এখানে থাকবেন। আপনারা স্বাধীন থাকবেন একটি শর্তে। সেই শর্তটি পালন করবার প্রতিশ্রুতি আপনাকে দিতে হবে।

—কী শর্ত বলুন, আমি বললুম, আশা করি সেটা অসম্মানজনক কিছু হবে না।

—মোটেই না। শর্তটি হচ্ছে বিশেষ কোন কারণে আপনাদের নিজেদের কেবিনে থাকতে হবে কিছু সময়ের জন্যে। আমি বল-প্রয়োগের পথে যেতে চাই না। আপনাদের কথা দিতে হবে আপনারা এইরকম সময়ে আমার আদেশ মত কাজ করবেন। বলুন এতে আপনারা রাজি কিনা।

—আমি রাজি, আমি বললুম, এখন আপনি বলুন আমরা এই জাহাজ ছেড়ে যেতে পারব কিনা।

—না। ক্যাপ্টেন দৃঢ়স্বরে জানালেন।

—সে কী! আমি প্রচণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করলুম। আমরা আর কোনদিন আমাদের পরিজন, প্রিয় মাতৃভূমিকে দেখতে পাব না?

—না। দৃঢ়স্বরে জবাব দিলেন ক্যাপ্টেন, তা পাবেন না। তবে

কি জানেন মিস্টার এ্যারোনাক্স, নিজের দেশে যেতে না পারার যতটা কষ্ট হবে বলে আপনি ভাবছেন, আসলে কিন্তু ততটা হবে না।

নেড এই কথা শুনেই চেঁচিয়ে উঠে বলল, আমি কিন্তু এই শর্তে রাজী নই তা বলে দিচ্ছি।

—তুমি রাজি আছ কি না তা তোমাকে জিগ্যেস করিনি নেড, শান্ত স্বরে বললেন ক্যাপ্টেন।

—দেখুন, আমি ক্যাপ্টেনকে বললুম, অবস্থার সুযোগ নিয়ে আপনি আমাদের যা বলছেন তা নিষ্ঠুরতা বই আর কিছু নয়।

—আপনি নিষ্ঠুরতা বলছেন কিন্তু আমি বলব এটা সহৃদয়তা। আপনারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন আমি আপনাদের কোন শাস্তি দেব না কিন্তু তাই বলে যে পৃথিবীর সঙ্গে আমি সব সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলেছি সেখানে আপনাদের আমি ফিরে যেতে দিতে পারি না।

এমন দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি এই কথাগুলি বললেন যে আমার মনে হল এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ হবে না।

এরপর ক্যাপ্টেন বললেন, আমার এই জাহাজের লাইব্রেরীতে আপনার লেখা "অতল সমুদ্র" নামে বইটি আছে। আমার মনে হয় আপনি এই সমুদ্রের সব দিক না দেখেই এই বইটি লিখেছেন। আপনি যে সময়টা এই জাহাজে কাটাবেন, জানবেন সেটা আপনি উপভোগই করবেন।

ক্যাপ্টেনের এই কথাগুলি আমার অন্তর স্পর্শ করল। আমার বন্দীদশার কথা ভুলে গিয়ে আমি তাঁকে জিগ্যেস করলুম, আপনার নামটা জানতে পারি কি ?

—আপনারা আমায় ক্যাপ্টেন নিমো বলে ডাকবেন। আর আমার এই জাহাজের নাম হল নটিলাস। এখন দয়া করে আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

আমি তার পেছন পেছন গেলুম। বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত একটা সরু পথ দিয়ে যাবার পর আমাদের সামনে একটি দরজা খুলে গেল।

আমরা প্রবেশ করলুম এক সুসজ্জিত ডাইনিং রুমে। এই ঘরের চেয়ার টেবিল দামী পোর্সিলিনের বাসন-পত্র সবই এই মালিকের সুন্দর রুচির পরিচয় দিচ্ছিল। ক্যাপ্টেন ও আমি দুটি চেয়ারে বসলাম।

—এই খাবারের বেশির ভাগ পদের সঙ্গে আপনি পরিচিত নন, ক্যাপ্টেন নিমো আমায় বললেন। তবে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও মাছ দিয়ে তৈরি এই খাদ্যগুলি আপনি নির্ভয়ে খেতে পারেন। এগুলি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু।

আমি একে একে সব খাবারগুলি চেখে চমৎকৃত হয়ে গেলুম। শুধু নানারকম মাছ নয় কচ্ছপের মাংসেরও একটা চমৎকার পদ রান্না করা হয়েছে।

—প্রেফেসর, একবার সমুদ্রের ভিতরে বাস করে দেখুন, ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, কী আনন্দ আর স্বাধীনতার সন্ধান আপনি পান এখানে। আমি এখানে অসীম আনন্দ পাই। এখানে আমি স্বাধীন।

এর পর তিনি আমায় নিয়ে গেলেন তাঁর লাইব্রেরীতে। দামী আবলুস কাঠের তৈরি শেলফে অসংখ্য বই সাজানো রয়েছে দেখতে পেলুম। এত সুন্দরভাবে সাজানো সে ঘর যেন আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস হল না। 'ক্যাপ্টেন নিমো, আমি বিস্ময় গোপন করতে না পেরে বলে উঠলুম, সমুদ্রের তলায় এত বড় লাইব্রেরী আপনি তৈরি করলেন কী করে। আমার তো মনে হয়, কম করে প্রায় সাত হাজার বই রাখা আছে আপনার এই শেলফগুলিতে।'

—উঁহু, বারো হাজার, উত্তর দিলেন ক্যাপ্টেন। এই বইগুলিই পৃথিবীর সঙ্গে আমার একমাত্র টান। আপনি এই বইগুলি আপনার ইচ্ছেমত পড়তে পারেন প্রফেসর!

ক্যাপ্টেন নিমোর এই সহৃদয়তার জন্যে আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ ক্যাপ্টেন। এতে বিজ্ঞানের অমিত সম্পদ আছে। এ থেকে আমি খুবই লাভবান হবো।

এরপর ক্যাপ্টেন সেই ঘরের আর একটি দরজা খুললেন এবং সেটা দিয়ে আমরা একটা আলোকিত বিরাট ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করলুম।

ঘরটির মধ্যে ছিল শিল্প ও প্রকৃতিবিদ্যার নানা রকম সংগ্রহ, সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য এবং আধুনিক চিত্রকলার মূল্যবান সব নমুনা।

ঘরটির চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে আমি বললুম, ক্যাপ্টেন, 'আমার মন বলছে আপনি একজন উঁচুদরের শিল্পী।'

—আমি একজন নেহাতই শখের শিল্পী। মানুষের সৃষ্ট সুন্দর জিনিস সংগ্রহ করতে আমি ভালবাসি। যে পৃথিবী আমার কাছে মৃত, সেই পৃথিবীর স্মৃতি বহন করছে ওই ছবিগুলি। ক্যাপ্টেন নিমো আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন চলুন, আপনার কেবিনটা দেখে নেবেন চলুন।

ক্যাপ্টেন আমাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন একটি অতি চমৎকার ঘরে। ঘরটিতে অন্যান্য আসবাবের মধ্যে ছিল একটি সুন্দর বিছানা ও একটি ড্রেসিং টেবিল।

—আপনার ঘরের পাশেই আমার ঘর। আমি ক্যাপ্টেনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানোর পর তিনি বললেন।

এবার তিনি আমাকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁর ঘরের দেওয়ালে নানা যন্ত্রপাতি। ক্যাপ্টেন সেগুলি আমাকে এক এক করে দেখাতে দেখাতে বললেন, 'এটা হল থার্মোমিটার—এর দ্বারা নটিলাসের তাপমাত্রা জানা যায়। এই ব্যারোমিটারের সাহায্যে বাতাসের ওজন ও আবহাওয়ার পূর্বাভাষ জানা যায়। এই হল স্টর্ম গ্লাস, এর মধ্যে আসন্ন ঝড়ের সংকেত ফুটে ওঠে। এই ক্রনোমিটারের দ্বারা দ্রাঘিমার হিসেব করতে পারি। আর এই কাঁচগুলির সাহায্যে দিগন্তরেখার কোনখানে নটিলাস ভেসে উঠল তা বুঝতে পারি।'

এরপর ক্যাপ্টেন যা বললেন তা শুনে আমি চমকে উঠলাম। তিনি বললেন, 'এইসব যন্ত্র ছাড়া আমাদের আরও একটি শক্তি আছে যার ক্ষমতা অসীম। সেটা হল বিদ্যুৎ।'

—বিদ্যুৎ! আমি বিস্ময়ের সঙ্গে বললুম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তবে আমি যে বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহার করে থাকি

তা অন্য রকমের। আপনি জানেন সমুদ্রের জলে থাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড, ম্যাগনেশিয়াম ও পটশিয়াম ক্লোরাইড। এই সোডিয়াম ক্লোরাইড থেকে আমি তৈরি করি বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎ আমাদের আলো আর গতি দেয়।

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি দেখে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, এই কিন্তু সব নয় ক্যাপ্টেন, আসুন আপনাকে আরো একটি জিনিস দেখাই।

ক্যাপ্টেনকে অনুসরণ করে আমি জাহাজের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখলুম সেখানে একটি লোহার সিঁড়ি ঝোলানো রয়েছে দেয়ালের সঙ্গে।

—সিঁড়িটা কি কাজে লাগে? আমি প্রশ্ন করলুম ক্যাপ্টেনকে।

—সিঁড়ির ওপরে একটি ছোট নৌকো রাখা আছে।

—নৌকো! আমি বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করে উঠেছি।

—হ্যাঁ, সুন্দর এবং হাল্কা নৌকো। এর ভেতর জল ঢুকতে পারে না। দুটি আঁকড়ার সাহায্যে এটি আটকানো থাকে। এই মইটা দিয়ে উঠে গেলে একটা গর্তের ভেতর দিয়ে নৌকোটায় পৌছনো যায়। নৌকোয় উঠে ঢাকনা বন্ধ করে আমি নৌকো চালিয়ে দিই।

—কিন্তু আপনি নটিলাসে ফিরে আসেন কেমন করে?

—আমি ফিরি না। নটিলাস আর নৌকোর মধ্যে ইলেকট্রিক তারের যোগাযোগ আছে। সেই তারের সাহায্যে আমি খবর পাঠালে নটিলাস আমার কাছে চলে আসে।

—বাঃ ভারী চমৎকার তো! মুগ্ধ হয়ে বললুম আমি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমি নেড ও কনসীলের দেখা পেলুম। এরপর তিনজনে গেলুম জাহাজের রন্ধনশালায়। সমস্ত রান্নাই সেখানে বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে সম্পন্ন হয়। রান্নাঘরের পাশেই সুসজ্জিত স্নানঘর। তার নিচে একটা পার্টিশনা আছে। তার একপাশে অফিস ও একপাশে ইঞ্জিন-ঘর।

—আসুন আমার সঙ্গে আমার পড়বার ঘরে। ক্যাপ্টেন নিমো

বললেন, 'সেখানে নটিলাসের সম্পর্কে আরও অনেক খবর জানাবো আপনাকে।'

এগারো

—দেখুন মঁসিয়ে এ্যারোনাক্স, নটিলাসের খসড়াটা আমার চোখের সামনে মেলে ধরে ক্যাপ্টেন বললেন, 'এর আকৃতি অনেকটা চুরুটের মতো। এর সম্পূর্ণ আয়তন হাজার মিটারের ওপর, ওজন পনেরো শ' টন। জলে ভেসে থাকার সময় নটিলাসের দশ ভাগের এক ভাগ বেরিয়ে থাকে। জাহাজটিকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে জল আটকে রাখার ট্যাংক-গুলি জাহাজের নিচে থাকে। জল ভরার জন্য কল খোলা থাকে এবং জল ভরতে আরম্ভ করলেই জাহাজটি জলের নিচে ডুবতে আরম্ভ করে।'

—আচ্ছা, এটা তো বুঝলুম কিন্তু আরও একটা ব্যাপার থেকে যাচ্ছে আপনি যে ভাবে জল খালাস করে ওপরে ওঠার কথা বলছেন তাতে আপনার পাম্পগুলির তো প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে ১৫০০ পাউণ্ড চাপ সহ্য করার কথা। কথা হচ্ছে, কোন্ শক্তির সাহায্যে—

—সে শক্তি কেবল বিদ্যুৎই দিতে পারে, ক্যাপ্টেন বললেন, 'আর যদি সমুদ্রের পাঁচ কি সাত মাইল নিচে যাবার প্রয়োজন হয় বা ডানদিক কি বাঁদিকে ঘোরানোর প্রয়োজন হয় তবে আমি রাডারের সাহায্য নিই। আর যদি খুব তাড়াতাড়ি ওপরে উঠতে চাই তাহলে খুব জোরে জল ছাড়তে আরম্ভ করি। জলের চাপ বেড়ে যাওয়ায় জাহাজটি গ্যাস-পোরা বেলুনের মত ওপরে উঠতে থাকে?'

—বাঃ চমৎকার! ক্যাপ্টেন আপনার বাহাদুরি আছে স্বীকার করতে হবে। কিন্তু একটা কথা, জাহাজের চালক সমুদ্রের মাঝখানে দিক নির্ণয় করে কি করে?

—জাহাজের চলক থাকে একটি ছোট কামরায়। কামরার চার-দিকে বিশেষ এক ধরনের কাঁচ লাগানো থাকে। এই কাঁচ জলের চাপ প্রতিরোধ করতে সক্ষম। চালকের খুপরির ঠিক পেছনে একটি শক্তি-

শালী বৈদ্যুতিক রিফ্লেক্টর আছে। এই রিফ্লেক্টরের এক মাইল দূর পর্যন্ত সমুদ্র আলোকিত হয়ে ওঠে।

—ওঃ আশ্চর্য! আমি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে উঠি, 'এতক্ষণে আমি বুঝতে পারছি যে, জাহাজ থেকে দাঁতাল তিমির গায়ের ফসফরাসের ঝিকিমিকি ভেবে আমরা এই আলোই দেখতুম। আপনার নটিলাস এক অপূর্ব সৃষ্টি।'

—শুধু তাই নয়, ক্যাপ্টেন বললেন, 'এই নটিলাস হল আমার প্রাণ। লোহার চাদর দিয়ে মোড়া এ জাহাজ সম্পূর্ণ নিরাপদ। এতে দাহ্য পদার্থ কিছু নেই, কাজেই আগুন লাগার ভয় করতে হয় না। সব কাজ হয় বিদ্যুতের সাহায্যে। নটিলাস আমার এক নিখুঁত সৃষ্টি। এর কথা ভাবলে গর্বে আমার বুক ফুলে ওঠে।'

—কোন জায়গায় বসে এত বড় একটি কাজ সমাধা করলেন?

—শুনলে অবাক হবেন আমার কারখানাটি ছিল সমুদ্রের মধ্যে এক মরুদ্বীপে। সেখানে আমার কয়েকজন সহকর্মীকে নিয়ে আমি এই কাজটি সম্পন্ন করি। তারপর সেই দ্বীপে আগুন ধরিয়ে দিয়ে আমাদের কাজের ছিদ্র নষ্ট করে ফেলি।

—আপনি বেশ ধনী—তাই না?

—ঠিকই ধরেছেন। নটিলাস তৈরি করতে সাকুল্যে খরচ পড়েছিল ২০০,০০০ পাউণ্ড। তারপরও আমার যা আছে, তা থেকে ফ্রান্সের সমস্ত জাতীয় ঋণ যদি আমি শোধ করে দিই তবুও আমার টাকা ফুরোবে না।

নির্বাক বিস্ময়ে আমি এই অদ্ভুত মানুষটির দিকে তাকিয়ে থাকি। উনি কি আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন? কিন্তু না, ওঁর মুখের ভাব দেখে তো তা মনে হয় না। হয়ত ভবিষ্যতই আমার এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারবে।

বারো

পরের দিন অর্থাৎ ৯ই নভেম্বর আমি এক নাগাড়ে বারো ঘণ্টা ঘুম দেবার পর উঠলুম।

নিয়মমাফিক কনসীল আমার কাছে এসে হাজির হল ও আমি কেমন ঘুমিয়েছি জিগ্যেস করল। কনসীলের কাছেই জানলুম যে নেড এখনও ঘুমোচ্ছে।

জামা-কাপড় পরে আমি সেলুনে গেলুম কিন্তু সেখানে ক্যাপ্টেন নিমোর দেখা পেলাম না।

কাঁচের আধারে রাখা বিভিন্ন সামুদ্রিক উদ্ভিদগুলি পর্যবেক্ষণে আমি তখন মন দিলুম। এর মধ্যে ছিল গর্টসেলি, সাডোনারি, লাল রঙের সিরামী, কিছু নাটাবুলি জাতীয় উদ্ভিদ ইত্যাদি।

সারা দিনের মধ্যে একবারও ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে সাক্ষাতের ভাগ্য হল না। সেলুনের দরজাগুলি যেমন বন্ধ ছিল তেমনি বন্ধ রয়ে গেল।

তারপরের দিনও সেই ব্যাপার ঘটল। ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে এক-বারের জন্যেও দেখা হল না। ফলে দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় আমায় কনসীল আর নেডের সঙ্গে কাটাতে হল।

এই দিন থেকে আমি আমার যাত্রাপথের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাগুলি একটি ডায়েরীতে লিখে রাখছিলুম। এতে খুঁটিনাটি কোন তথ্যই বাদ দিই নি।

১২ই নভেম্বর। ভোরবেলা। খোলা বাতাস গায়ে লাগতে বুঝলুম যে, অক্সিজেন সংগ্রহ করবার জন্যে নটিলাস জলের ওপর ভেসে উঠেছে। লোহার সিঁড়িটা দিয়ে আমি প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে এলাম।

ওপরে কি ক্যাপ্টেন নিমোকে দেখতে পাব? কিন্তু না, সেই ছোট খুপরির মধ্যে চালক ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন প্রাণী নেই।

আস্তে অস্তে কুয়াশা কাটতে থাকল। নবোদিত সূর্যের আলোয় সমুদ্রের উপরিভাগ রক্তিম হয়ে উঠল। এমন সময় পেছনে পায়ের

শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখি ক্যাপ্টেনের সহকারী এসে হাজির হয়েছেন। চোখে দূরবীন লাগিয়ে তিনি দূরে কি দেখতে থাকলেন।

পাঁচদিন এইভাবে কাটল। প্রত্যেক দিন সকালে আমি জাহাজের ডেকে উঠে ক্যাপ্টেনের সহকারীর দেখা পেতুম। কিন্তু ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হত না। আমার ধারণা জন্মালো যে আর কোনদিনই হয়ত ক্যাপ্টেনের দেখা পাব না।

কিন্তু এ ভুল ভাঙলো ১৬ তারিখে। কনসীল আর নেডের সঙ্গে আমার ঘরে ফিরে আমি টেবিলের ওপর একটা চিঠি পেলুম। জার্মান হরফে তাতে এই কথাগুলি লেখা ছিল।

প্রফেসর এ্যারোনাক্স

নটিলাস জাহাজ

ক্যাপ্টেন নিমো কাল সকালে আপনাকে ক্রেস্পো দ্বীপের জঙ্গলে এক শিকার সফরে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। তিনি আশা করছেন প্রফেসর তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে এই শিকার-পর্বে যোগ দেবেন।

ইতি

ক্যাপ্টেন নিমো।

—শিকার। নেড চেঁচিয়ে উঠলো, সমুদ্রের নিচে ?

—তা-ও আবার ক্রেস্পো দ্বীপের জঙ্গলে। কনসীল যোগ দিল।

—আমাদের এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করাই উচিত হবে। আমি মন্তব্য করলুম।

নেড বলল, একবার শুকনো ডাঙায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলে যে কি করতে হবে তা আমি জানি। এক টুকরো টাটকা হরিণের মাংস পেলে আমি আর কিছু চাইব না।

পরের দিন অর্থাৎ ১৭ই নভেম্বর ঘুম থেকে উঠে আমি বুঝতে পারলাম যে নটিলাস স্থির হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে উঠতেই দেখা পেলুম ক্যাপ্টেন নিমোর। আমাকে অভিবাদন জানিয়ে

তিনি জিগ্যেস করলেন এই অভিযানে যেতে আমার সম্মতি আছে কি না। আমি আমার সাগ্রহ সম্মতি জানালুম।

খাবার ঘরে প্রবেশ করার পর আমাদের প্রাতরাশ পরিবেশন শুরু হল।

—প্রফেসর আসুন, একটু জলযোগ করে নিন। ক্যাপ্টেন আমাকে অহ্বান জানালেন। কেন না যে জঙ্গলে আমরা যাচ্ছি সেখানে কোন হোটেল পাওয়ার সম্ভবনা নেই। তাই বেশ পেট ভরে খেয়ে নেওয়া যাক।

—আচ্ছা ক্যাপ্টেন, আপনি যে বাতাস সঙ্গে নিয়ে যান তা তো সঙ্গে সঙ্গে ফুরিয়ে যায় এবং তাতে যে শতকরা পনেরো ভাগ অক্সিজেন থাকে তা দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলে না।

—ঠিক, কিন্তু প্রফেসর আমি আপনাকে আগেই বলেছি যে নটিলাসের পাম্পগুলি প্রচুর পরিমাণে বাতাস রাখতে সক্ষম। এই নয় বা দশ ঘণ্টা পর্যন্ত সমুদ্রের নিচের লোকদের নিশ্বাস নেওয়ার মত বাতাস সরবরাহ করতে পারে।

—এটা বেশ বোঝা গেল, আমি বললুম, আমার আর একটি প্রশ্ন ক্যাপ্টেন, সমুদ্রের একেবারে নিচে আপনি আলো জ্বালেন কি করে?

—রুমকর্ফের তৈরি যন্ত্রের সহায্যে। এর একটি পিঠে বাঁধা থাকে আর একটি থাকে কোমরের সঙ্গে ঝোলানো। আমি বাইক্রোমেট আর পটাশের সাহায্য না নিয়ে সোডিয়াম দিয়ে কাজ করা পছন্দ করি।

একটি তার দিয়ে বিদ্যুৎটি একটি বিশেষ ভাবে তৈরি লণ্ঠনের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। এই লণ্ঠনের মধ্যে অল্প পরিমাণ কার্বলিক গ্যাস থাকে, যন্ত্রটি চালু হলে এই গ্যাসটি জ্বলে ও এর ফলে একটি উজ্জ্বল সাদা শিখার সৃষ্টি হয়।

—আলো আর বাতাসের ব্যাপার না হয় বুঝলুম কিন্তু ক্যাপ্টেন, আমরা যে বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যাব সে কী ধরনের বন্দুক হবে?

—বন্দুকটা হবে এয়ার গান জাতীয়। এখানে গন্ধক বা কাঠকয়লা

ছাড়া আমি বারুদ তৈরি করব কি করে? তাই বারুদের অভাবে আমি বাতাস ব্যবহার করি।

—কিন্তু আমার মনে হয় এই অল্প আলোয় আর অত স্রোতের মধ্যে আমাদের বন্দুকের গোলায় এমন জোর নেই যে তার আঘাতে কোন প্রাণীর মৃত্যু ঘটতে পারে।

—না, ঠিক উল্টো। বরং বন্দুকের গোলায় মৃত্যু হওয়ার সম্ভবনা আরও বেশি। কেননা এই গোলাগুলি ঠিক সাধারণ গোলার মত নয়। এগুলি কাঁচের তৈরি আর এর ভেতরে থাকে সীসের গুলি। অল্প একটু চাপ পেলেই এগুলি সজোরে বন্দুক থেকে বেরিয়ে যায় এবং যত শক্তিশালী জন্তুই হোক না তাকে ধরাশায়ী করে।

—আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, উঠে দাঁড়িয়ে আমি বললুম, এখন শুধু আমার বন্দুকটি হাতে তুলে নেওয়া বাকি। তারপর আপনি যেখানে যাবেন টুঁ শব্দটি না করে আমি আপনার পেছনে পেছনে যাব।

তেরো

ক্যাপ্টেনের নির্দেশে দুজন নাবিক এসে আমাদের ডুবুরির পোশাক পরিয়ে দিল। পোশাকগুলি ভারী এবং রবারের তৈরি। ক্যাপ্টেন নিমো, তাঁর এক সঙ্গী, আমি ও কনসীল এই চারজন এই পোশাক পরলুম। নেড কিছুতেই এই বিজাতীয় পোশাক পরতে রাজী হল না।

বন্দুকগুলো কুঁদো ফাঁপা এবং লোহা দিয়ে তৈরি। এটি বাতাস ধরে রাখবার জন্যে তৈরি হয়েছে। কুঁদোর গায়ে একটা বাক্সয় কুড়িটা গুলি রাখা আছে। একটি ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি গুলি সেই পথে যাবার জন্যে এগিয়ে আসে। বোঝা গেল অস্ত্রটি একটি নিখুঁত সৃষ্টি।

ক্যাপ্টেন তাঁর মাথাটা ওই শিরস্ত্রাণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। আমি ও কনশীল তাঁর পথ অনুসরণ করলুম। এই শিরস্ত্রাণের তিনটি

ফুটো কাঁচ দিয়ে ঢাকা। এ দিয়ে আমরা সব দেখতে পাচ্ছিলুম। ওটা লাগানোর পর রুকোইয়েরল যন্ত্রটি আমাদের পিঠে লাগানো হল।

এখন আমাদের সাজ সম্পূর্ণ। আমার হাতে বন্দুক এবং কোমরে আলো। এখন ইচ্ছে করলেই আমি এগিয়ে যেতে পারি। কিন্তু এত ভারি পোশাক পরে আর পায়ে সীসের জুতো গলিয়ে আমি যেন নড়তেই পারছিলুম না।

কিন্তু হঠাৎ মনে হল কিসের চাপে আমি এগিয়ে চলেছি। আমার সঙ্গীরা চলল আমার পিছু পিছু। আমাদের পেছনের দরজাটি যে বন্ধ হয়ে গেল তা বুঝতে পারলুম এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, আমাদের চতুর্দিকে থৈ থৈ করছে অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পর একটা হিস্‌হিস্‌ শব্দ শোনা গেল। বুঝতে পারলুম যে কোথাও একটা কল আছে এবং তাই দিয়ে জল ঘরে ঢুকছে। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘরটা জলে. ভর্তি হয়ে গেল। আর একটা দরজা ছিল সেটা খুলে গেল এবার। একটা ক্ষীণ আলোর রেখা দেখতে পেলুম। বুঝতে পারলুম যে, আমরা সমুদ্রের নিচের জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছি।

সমুদ্রতলে দাঁড়িয়ে বা হেঁটে আমার মনে যে অনুভূতি জন্মালো তাকে ব্যক্ত করবার মত ভাষা আমার নেই। এখন আর আমার পোশাক ও শিরস্ত্রাণ আর ভারী বোধ হচ্ছে না।

সমুদ্রের নিচের আলো দেখে আশ্চর্য হলুম। মনে হল যে পৃথিবীর ওপর যেমন বাতাস আমাদের ঘিরে থাকে তেমনি সমুদ্রের নিচে আমাদের ঘিরে রয়েছে জল। আমরা হাঁটছিলুম বালির ওপর দিয়ে। সূর্যের আলো এই বালিতে লেগে প্রতিফলিত হয় এবং সমুদ্রতল আলোকিত হয়। সমুদ্রের ত্রিশ ফুট নিচেও আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন দিনের আলোর মত সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিত মত আমরা তাঁর পেছন পেছন চলছিলুম। হঠাৎ দেখলুম যে মাটির রং বদলে যাচ্ছে।

বালি শেষ হয়ে এবার শুরু হল পিচ্ছিল মাটির দেশ। এই সমতল ভূমিতে সামুদ্রিক উদ্ভিদের প্রাচুর্য দেখতে পেলুম। দেখলুম ফিতের মত সরু 'ফিউকাস' ভেসে যাচ্ছে আর দেখলুম 'লরেন্সি' ও ক্ল্যাভোস্টেফি নামের আমার চেনা উদ্ভিদ।

প্রায় দেড় ঘণ্টা হল আমরা নটিলাস ছেড়ে চলে এসেছি। তখন প্রায় দুপুর। সূর্যরশ্মি তির্যক থেকে সরল হয়ে উঠল এবং আস্তে আস্তে তার সুন্দর রংগুলি অন্তর্হিত হয়ে গেল।

আমরা হাঁটতে লাগলুম। ক্ষীণ, মৃদু আওয়াজ যে ভাবে আমাদের কানে এসে সজোরে বাজছিল, তাতে শব্দের পরিবাহক হিসেবে জলকে বাতাসের চেয়ে বেশি শক্তিশালী বলে মনে হল। এখন আমরা প্রায় একশো গজ নিচে।

এখনও আমি সূর্যের আলো দেখতে পাচ্ছি। এখনও পর্যন্ত আমাদের রুমকর্ফ আলো জ্বালবার প্রয়োজন দেখা দেয় নি। এই সময় হঠাৎ ক্যাপ্টেন নিমো দাঁড়িয়ে পড়ে দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। সামনে তাকাতে একটা বিশাল ছায়ার আভাস চোখে পড়ল।

ওই নিশ্চয় ক্রেম্পো দ্বীপের জঙ্গল, আমি মনে মনে বললুম।

একটু পরেই বুঝলুম আমার অনুমান মিথ্যে হয় নি।

চোদ্দ

অবশেষে আমরা ক্রেম্পোর জঙ্গলে এসে পৌঁছলুম। এখানে প্রথম যে জিনিসটা দেখে আমরা অবাক হলুম তা হল এখানকার গাছের গঠন-প্রকৃতি। কোন লতা বা গাছেরই শাখা বাঁকা নয়, সমস্ত উদ্ভিদই লম্বের মত সিধে ওপর দিকে বেড়ে উঠেছে।

এই উদ্ভিদগুলির জন্ম জলে। জলই এদের জীবনীশক্তি যোগায়। বেশীর ভাগ উদ্ভিদেরই পাতা নেই। তার বদলে গা থেকে গোলাপী সবুজ, খয়েরি রংয়ের আঁকড়া বেরোয়।

ঘণ্টা কয়েক ঘোরবার পর আমাদের বিশ্রাম করবার দরকার হল। একটা গাছের তলায় বসার সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখে ঘুম নেমে এল আমার। বেশ কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে শরীর ঝরঝরে হয়ে গেল। ঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙতে যাচ্ছি হঠাৎ আচমকা একটা প্রাণীর ছায়া দেখে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লুম।

দেখতে পেলুম ঠিক কয়েক হাত দূরে এক অতিকায় মাকড়সা চোখ পিটপিট করে আমাকে দেখছে। প্রাণীটা প্রায় তিন ফুট উঁচু। সে আমার ওপর লাফ দেবার সুযোগ খুঁজছে। তার সে ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলুম। ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন নিমোর ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বন্দুকের বাঁট দিয়ে প্রাণীটিকে আঘাত করলেন আর আমি দেখলুম সঙ্গে সঙ্গে সে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। ক্যাপ্টেন নিমো তাকে শেষ করে এগিয়ে চললেন। প্রায় তিনটের সময় আমরা একটা সংকীর্ণ উপত্যকার কাছে এসে পৌঁছলুম।

এরপর ফেরার পালা। একটা নতুন পথ দিয়ে আমরা নটিলাসে ফিরছিলুম। এই পথটা খাড়াই এবং এতে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। সূর্য তখন অস্তমুখী তাই তার আলো সমস্ত রাস্তার ওপর রংয়ের মায়া সৃষ্টি করল। এর কিছুক্ষণ পরে আমরা এক ঝাঁক মাছের মধ্যে সাঁতরে গেলুম। তখনও পর্যন্ত আমরা শিকার করবার মত কোন মাছ পাই নি। হঠাৎ দেখলুম ক্যাপ্টেন নিমো ঝোপের দিকে লক্ষ্য করে তাঁর বন্দুক ছুঁড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল চাপা হিস্‌হিস্ শব্দ। এর পরই ভারী একটা জন্তুর পতনের শব্দ। কাছে গিয়ে দেখলুম সেটা একটা বিরাট ভোঁদড়। এই প্রাণীটি পাঁচ ফুট লম্বা। এর বাদামী রংয়ের চামড়া দিয়ে খুব ভাল ফার কোট তৈরি করা যেতে পারে। অদ্ভুত গোল মাথা ও ছোট কান বিশিষ্ট এই স্তন্যপায়ী প্রাণীটিকে দেখে আমার বেশ ভাল লাগল।

ঠিক এই সময় আরেকটি শিকার করা হল। বন্দুকের আওয়াজ শুনে আমরা থরথরিয়ে কেঁপে উঠেছিলুম। একটা বিরাট পাখি তার

পাখা দুটি বিস্তার করে আমাদের মাথার ওপর উড়ছিল। পাখিটা ঠিক যখন জলের মাত্র ক'গজ ওপরে তখন ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গী বন্দুকটি কাঁধ থেকে নামিয়ে তার দিকে গুলি ছোঁড়ে। গুলি খেয়ে পাখিটা সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। জল থেকে তোলবার সময় দেখলুম সেটি একটি ভাল জাতের এ্যালব্যাট্রস।

ক্যাপ্টেন নিমোর থেকে আমি কয়েক পা পেছনে হাঁটছিলুম। হঠাৎ দেখলুম তিনি তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাতের চাপ দিয়ে আমাকে বসে পড়তে বললেন। তাঁর সঙ্গীও কনসীলকে অনুরূপ অনুরোধ করল। এরপর যা ঘটল তা দেখে আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল।

আমাদের ঠিক ওপর দিয়ে দুটি ভয়ংকর জাতের হাঙর সাঁতরে চলে গেল। কী সাংঘাতিক প্রাণী। ভয়ে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল। একবার এদের দাঁতের মধ্যে পড়লে আর নিস্তার নেই।

ভাগ্য ভাল যে, আমাদের ওপর দিয়ে যাওয়ার জন্যে হাঙরগুলো আমাদের দেখতে পায় নি। আধঘণ্টা পরে নটিলাসের আলো অনুসরণ করে আমরা তাতে গিয়ে পৌঁছলুম। আমরা সেলটিতে প্রবেশ করবার পর ক্যাপ্টেন নিমো দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর তিনি একটি বোতাম টিপলেন, নটিলাসের পাম্পগুলি চালু হল। আমরা ডুবুরির পোশাক খুলে যে যার ঘরে গেলুম। কেবিনে গিয়ে আমি একমনে এই চমকপ্রদ অভিযানের কথা ভাবতে লাগলুম।

পনেরো

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে আমি বেশ তাজা বোধ করলুম। শয্যাত্যাগ করে দাঁড়ালুম নটিলাসের উঁচু প্ল্যাটফর্মটার ওপর।

কিছুক্ষণ পর ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে এসে হাজির হলেন। তাঁর

পেছন পেছন এল কয়েকজন জোয়ান নাবিক। রাত্রে যে জাল ফেলে রাখা হয়েছিল সেই জাল তোলবার জন্যে এরা এসেছে বুঝতে পারলুম।

জালটা ধীরে ধীরে তোলা হল। বিচিত্র ধরনের মাছ ধরা পড়েছিল তার মধ্যে। এক রকমের ব্যাঙের মত দেখতে মাছ—ট্রিগার-ফিশ, ল্যামপ্রি এবং ট্রিচিওরি প্রভৃতি। আমি দেখে আন্দাজ করলুম এই জালে প্রায় নশো পাউণ্ড মাছ ধরা পড়েছে। কিছু টাটকা খাওয়ার জন্যে তখুনি রান্নাঘরে চালান করে দেওয়া হল, কিছু আচারের মত করে খাওয়ার জন্যে রেখে দেওয়া হল।

মাছ ধরা পর্ব শেষ হবার পর আমি যখন আমার কেবিনে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছি তখন ক্যাপ্টেন নিমো আমার দিকে প্রশ্ন করলেন, প্রফেসর, 'সমুদ্রের গভীরতা কত আপনি জানেন?'

জবাব দিলুম, 'সমুদ্রের গভীরতা ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন। যেমন উত্তর অতলান্তিকের গভীরতা ৮০০০ গজ, আবার ভূমধ্য সাগরের গভীরতা ২৭০০ গজ। দক্ষিণ অতলান্তিকের ১২,০০০ থেকে ২৫,০০০ গজের মধ্যে।'

—বেশ, ক্যাপ্টেন নিমো একটু হাসলেন, আমি আপনাকে দেখাবো যে সমুদ্রের এই অংশের গভীরতা মাত্র ৪০০০ গজ। আসুন আমার সঙ্গে।

ক্যাপ্টেন সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। তাঁর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম আমরা দুজন। ঘড়ির কাঁটার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ক্যাপ্টেন বললেন, 'ওই দেখুন।' আমি অবাক হয়ে দেখলুম ঘড়ির কাঁটার হিসেবে জলের গভীরতা নির্দেশ করছে ঠিক তিনি যা বলেছিলেন সেই মাত্র চার হাজার গজ।

১১ই ডিসেম্বর দিনের বেলায় আমি যন্ত্রপাতির ঘরটিতে বসে পড়াশুনো করছিলুম। নেড আর কনসীল অর্ধখোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে ছিল জলের দিকে। নটিলাস তখন স্থির হয়ে একজায়গায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ কনসীল আমায় ডাকল, 'হুজুর, একটু

এদিকে দেখুন তো।' চেয়ার থেকে উঠে আমি তার কাছে গিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলুম জলের দিকে।

উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় আমি দেখতে পেলুম যে জলের নিচে বিরাটাকৃতি কালো মত কি একটা বস্তু স্থির হয়ে পড়ে আছে। প্রথমে আমি ভাবছিলুম যে এটা একটা সামুদ্রিক প্রাণী। কিন্তু ভাল করে ঠাহর করে দেখার পর আমি অস্ফুট স্বরে বলে উঠলুম, একি, 'এ যে একটা জাহাজ!'

—হ্যাঁ। জাহাজই, নেড বলল, জলের নিচে লম্বালম্বি হয়ে পড়ে আছে।

নেড ঠিকই বলেছিল, আমরা একটা নিমজ্জমান জাহাজের খুব কাছাকাছি চলে এসেছি। জাহাজের মাস্তুলটি ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। জাহাজটির ভেতরে কতকগুলির মৃতদেহ দেখে বড় মন খারাপ হয়ে গেল। মৃতদেহগুলির মধ্যে একটি মৃত শিশু কোলে মাকেও দেখতে পেলুম। জাহাজের চালকের হাত দুটি তখন জাহাজের চাকা ধরে আছে। বুঝলুম যে শেষ পর্যন্ত লোকটা জাহাজকে বাঁচানোর জন্যে অবিরাম সংগ্রাম করে গেছে।

নিজের গতিপথে নটিলাস এগিয়ে চলল। ঠিক সেই সময় আমি জাহাজের গায়ে লেখা নামটি পড়তে পারলুম 'দি ফোরিডা, সাণ্ডারল্যাণ্ড।'

ষোল

২৮শে ডিসেম্বর রাত্রে নটিলাস ভ্যানিকোরোর তীর ছেড়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পাপুয়া দ্বীপ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

যেদিনকার কথা বলতে যাচ্ছি সেটা ছিল ১৮৬৮ সালের পয়লা জানুয়ারী। সকাল হতেই প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে কনসীল আমাকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাল তার পক্ষ থেকে।

কনসীলের শুভেচ্ছা গ্রহণ করে তাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে জিগ্যেস করলুম, 'কনসীল তোমার কি মনে হয়? নতুন বছরে আমরা কি এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবো না কি আগের বছরের মতই এই অদ্ভুত সমুদ্র যাত্রা অব্যাহত থাকবে?'

—কী জানি হুজুর, হাত উল্টিয়ে বলল কনসীল, 'কী যে হবে আমি বুঝতে পারছি না।'

জাপান উপসাগরে আমাদের যাত্রা শুরু করা থেকে নতুন বছরের দ্বিতীয় দিন পর্যন্ত আমরা ১১,৩৪০ মাইল পথ অতিক্রম করেছি। ঠিক এই সময় আমাদের জাহাজ যেখানে ছিল, ১৭৭০ খৃস্টাব্দে ক্যাপ্টেন কুকের জাহাজ এইখানে এক প্রবাল-স্তূপে লেগে চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমার এই প্রবাল-স্তূপটি দেখার খুব ইচ্ছে ছিল।

ঠিক সেই সময় নটিলাস আরও নিচে ডুব দেওয়ায় আমার সে ইচ্ছে পূর্ণ হল না। জালে তোলা মাছগুলি দেখেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হল। গার্মন বলে ম্যাকারেল জাতীয় এক রকম বিরাট মাছ সেদিন জালে উঠেছিল। এই মাছগুলির গায়ে নীল রংয়ের ডোরা আঁকা থাকে। মাছগুলি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ডোরা-দাগ গুলি অন্তর্হিত হয়।

প্রবাল সমুদ্র পেরুনোর দুদিন পরে আমরা দিকচক্রবালে পাপুই দ্বীপের রেখা দেখতে পেলুম। ক্যাপ্টেন নিজে আমায় জানালেন যে তিনি টোরেস প্রণালী দিয়ে ভারত মহাসাগরে যেতে চান। টোরেস প্রণালীর মধ্যে অসংখ্য ছোটখাট দ্বীপ আছে। যার জন্যে এখান দিয়ে চলার সময় নটিলাসের গতি কমিয়ে দেওয়া হল।

—সমুদ্রের এই জায়গাটা ভাল নয়, প্ল্যাটফর্মের ওপরে উঠে চারিদিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল নেড।

—হ্যাঁ, বিশেষ করে নটিলাসের পক্ষে। আমি বললুম, 'চারিদিকে দেখছি অসংখ্য শিলাখণ্ড আর প্রবাল-স্তূপ।'

সত্যি নটিলাস খুব সতর্কতার সঙ্গে প্রবাল-প্রাচীরগুলি বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে যাচ্ছিল। তখন দুপুর প্রায় তিনটে। জোয়ার এসেছিল।

হঠাৎ একটা ধাক্কায় আমি ছিটকে পড়ে গেলুম। একটা খাঁড়ির সঙ্গে নটিলাসের সংঘর্ষ হয়েছে বুঝতে পারা গেল।

নটিলাসের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। যে জায়গায় নটিলাস আটকে গেছে সেখানে জলের স্রোত মাঝামাঝি; ফলে নটিলাসকে ঠিক ভাসানো যাচ্ছে না। তবে জাহাজের তেমন একটা ক্ষতি হয় নি। তলাটা অক্ষত আছে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তাকে নড়াতে না পারলে যে চিরকালের জন্যে এইখানে আটকে থাকবে।

আমি যখন এইরকম ভাবছি এমন সময় কাপ্টেন আমার কাছে এলেন।

—একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে তাই না কাপ্টেন?

—দুর্ঘটনা নয়, ঘটনা মাত্র, কাপ্টেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, প্রফেসর, 'নটিলাস এখনও হার মানে নি। আমি আপনাকে বলে রাখছি, এই নটিলাস আপনাকে আরও অনেক কিছু দেখাবে।' দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথাগুলি বলে কাপ্টেন তাঁর সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। পরক্ষণে ঘরে ঢুকে নেড জিগ্যেস করল, 'কেমন বুঝছেন?'

—আমি যা শুনলুম, তাতে মনে হচ্ছে জোয়ার না আসা পর্যন্ত অর্থাৎ আরও পাঁচ দিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

—আপনি বলছেন পাঁচ দিন, কাঁধ ঝাঁকিয়ে নেড বলল, 'আমি আপনাকে বলে রাখছি এই লোহার জাহাজটি আর কোনদিন জলে ভাসবে না। আর তাই আমার মনে হয় এবার আমাদের কাপ্টেন নিমোর কাছ থেকে মানে মানে বিদায় নেওয়াই মঙ্গল।'

—ভাই নেড, নটিলাসের সম্পর্কে তুমি যে রকম হতাশ হয়ে পড়েছ আমি ঠিক ততটা হইনি। কী হয় না হয় চার দিনের মধ্যেই জানতে পারব আমরা। আর পালানোর কথাই যদি বল তাহলে আমি বলব ফ্রান্স কি ইংল্যাণ্ডের কাছে থাকলেও সে কথা হয়ত ভাবা যেত। কিন্তু এই পাপুই দ্বীপের কাছে থেকে সে কথা চিন্তাও করা যায় না।

—কিন্তু এখন আমাদের দ্বীপে নামতে বাধা কি? এই দ্বীপে আছে হরেক রকমের প্রাণী, যাদের মাংস দিয়ে আমরা উদর-পূর্তি করতে পারি।

—হুজুর, নেডের এই কথাটায় আমারও সায় আছে। কনসীল বলল, 'এখন আপনি যদি ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আমাদের এই দ্বীপে নামবার অনুমতি আদায় করতে পারেন।'

—আমি বলে দেখতে পারি।

আশ্চর্য, একবার বলতেই ক্যাপ্টেন আমাদের এই প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন।

নেড ভারী খুশী। মাংস খাবার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে বলল, 'আজ অনেকদিন পরে মাংস খাবো। মাছ খেতে যে খারাপ তা আমি বলি না কিন্তু আগুনে ঝলসানো হরিণের মাংসের কাছে তা লাগে না।'

—দেখা যাক, এ জঙ্গলে কি আছে, আমি বলি, 'শিকার করতে এসে আমরা নিজেরাই না আবার শিকার হয়ে পড়ি।'

দাঁত কিড়মিড়িয়ে নেড বলল, 'আর কোন জন্তু না পেলে আজ যদি বাঘও পাই তারও রক্ষা নাই আমার হাত থেকে। আজ আমি বাঘের মাংস খাব।'

গর্জন করে উঠল নেড ল্যাণ্ড।

সতের

ডাঙায় নেমে বেশ লাগছিল। এই দু মাসে এই প্রথম আমরা মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে পারছি।

দ্বীপটি অপূর্ব সুন্দর। এক একটি গাছের গুঁড়িই প্রায় ২০০ ফুট উঁচু। এই বড় বড় গাছগুলিতে রয়েছে ফার্ণ জাতীয় একরকমের ঘন সন্নিবেশ।

কিন্তু নেড খুঁজছিল অন্য জিনিস। হঠাৎ একটা নারকেল গাছের খোঁজ পেয়ে কয়েকটা নারকেল পেড়ে ফেলল সে। তারপর ঢক ঢক করে তার জল খেয়ে বলল, 'চমৎকার।'

গল্প করতে করতে আমরা জঙ্গলের সবদিক ঘুরে ঘুরে দেখছিলুম। ঘুরতে ঘুরতে কিছু খাদ্যের সন্ধানও মিলল। এর মধ্যে একটা হল রুটিফলের গাছ। নেড এই ফল দেখেই লাফিয়ে উঠল।

শুকনো কাঠ জ্বালিয়ে সে একটু আগুন তৈরি করল। এই সুযোগে কনসীল আর আমি ভাল ভাল আর্টোকার্পাসের ফল সংগ্রহ করলুম।

কনসীল সেগুলি নেডের কাছে নিয়ে এল। ছুরি দিয়ে ফলগুলি কাটতে কাটতে নেড বলল, 'আপনি দেখবেন স্যার, খেতে এগুলি কী অপূর্ব লাগে। আর অনেকদিন পরে খাওয়া হচ্ছে বলে এর স্বাদ আরও ভাল লাগবে।'

ফলগুলি কিছুক্ষণ পোড়ানোর পর সেগুলোর বাইরেটা লালচে হয়ে গেল। ফলগুলি খেতে সত্যি ভারি চমৎকার।

এরপর আবার আমাদের জঙ্গল পরিক্রমা শুরু হল। আমরা সংগ্রহ করলুম বাঁধাকপি আর বীন। বিকেল পাঁচটার সময় পর্বত-প্রমাণ খাদ্যবস্তু নিয়ে আমরা নটিলাসে ফিরে এলুম। আমাদের অভ্যর্থনা করতে কেউ এগিয়ে এল না। মালপত্র নিয়ে আমরা আমাদের ঘরে গিয়ে নৈশ-ভোজ সমাধা করে শুয়ে পড়লুম।

পরের দিন ভোরবেলা আবার আমরা ওই দ্বীপটির উদ্দেশ্যে রওনা দিলুম। দ্বীপের পশ্চিম দিকটায় জঙ্গল অপেক্ষাকৃত ঘন। মাথার ওপর কতকগুলো মাছরাঙা পাখি উড়ছিল কিন্তু তারা আমাদের কাছে এল না। ঠিক এই সময় কনসীলের গুলীতে একটা বুনো পায়রা ধরাশায়ী হল। আগুন জ্বালিয়ে সেই পায়রা দুটোকে ঝলসিয়ে আমাদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হল।

আর এক ঘণ্টা হাঁটবার পর আমরা একটা সাবু গাছের জঙ্গল পেলুম। একটা বার্ড অব প্যারাডাইজ আমার হাতের খুব কাছে

এসেও পালিয়ে যাচ্ছিল কিন্তু কনসীল তক্কে তক্কে ছিল, ঝপ্ করে নিচু হয়ে সেটাকে ধরে ফেলল সে।

পাখিটাকে দেখে আমি চমৎকৃত হলুম। এমন সুন্দর পাখি আগে কখনও দেখিনি। বেলা দুটো নাগাদ নেড একটা শুয়োর শিকার করে ফেলল।

এরপর ওরা দুই বন্ধুতে ক্যাঙারু শিকারে মাতল। জঙ্গল ঠেঙাতে ঠেঙাতে ক্যাঙ্গারুগুলি ভয় পেয়ে বাইরে বেরিয়ে পালাতে চেষ্টা করল। কিন্তু তার আগেই ওদের বন্দুকের গুলী খেয়ে ধরাশায়ী হল তারা।

নেডের সেদিনের অভিযান খুবই সফল হয়েছিল। ভূরিভোজের পর হারপুন-বীর প্রস্তাব করল সেই দ্বীপেই রাত কাটানোর জন্য। কিন্তু সেটা করা সম্ভব হল না। সন্ধে ছ'টা নাগাদ আমরা তীরের কাছে গেলুম। দূরে অন্ধকারে বিকট ছায়ার মত দাঁড়িয়েছিল নটিলাস।

সেই তীরের কাছে বসে আমরা রাত্রের আহার সমাধা করলুম। আমাদের সে রাতের খাদ্য-তালিকায় দুটো বন-পায়রার রোস্ট ছিল, আর্টোকার্পাস রুটি, আম, আনারস ও ডাবের জল।

—আজ যদি আমরা নটিলাসে না ফিরি তো কি এসে যায়, কনসীল বলল।

নেডও কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক তখনই কোত্থেকে একটা পাথরের ঢেলা এসে আমার পায়ের কাছে এসে পড়ল।

এরপর আর একটা পাথর এসে লাগল কনসীলের হাতে ধরা একটি পায়রার গায়ে। এবার আমরা তিনজনেই উঠে দাঁড়িয়ে জঙ্গলের দিকে আমাদের বন্দুক উঁচিয়ে ধরলুম।

—কারা এরকম করছে? জঙ্গলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে প্রশ্ন করল কনসীল।

—এই দ্বীপের অসভ্য অধিবাসীরা, জবাব দিল নেড।

—তাড়াতাড়ি নৌকোয় গিয়ে উঠি চল, সমুদ্রের দিকে ছুটতে ছুটতে বললুম আমি। পালানো ছাড়া তখন উপায় নেই, কেন না

আমাদের থেকে শ খানেক পা দূরে অসভ্যদের দলকে দেখতে পাচ্ছিলুম আমরা। তাদের হাতে তীর ধনুক।

এইরকম বিপদের মধ্যেও নেড তার খাদ্যদ্রব্যের বোঝা কিন্তু ত্যাগ করে নি। এক কাঁধে মরা শুয়োর ও এক হাতে ক্যাঙারুগুলো নিয়ে সে প্রাণপণে নৌকোর দিকে ছুট দিল। দু মিনিটের মধ্যে নৌকোয় উঠে আমরা নৌকা ছেড়ে দিলুম।

কয়েক মিনিট পর আমরা নটিলাসে এসে পৌঁছলুম। দেখলুম ক্যাপ্টেন নিমো অর্গানের সামনে বসে গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজছেন। একবার ডাক দিয়ে আমি তাঁর সাড়া পেলুম না, দ্বিতীয়বার তাঁর হাত স্পর্শ করতে তিনি চমকে আমার দিকে তাকালেন।

—ও প্রফেসর, আপনি। আপনাদের শিকার বেশ ভাল হয়েছে তো?

—তা হয়েছে। কিন্তু এদিকে খারাপ খবরও আছে। কতকগুলি অসভ্য আমাদের ধাওয়া করে এসেছে।

—অসভ্য? কতজন হবে?

—অন্তত পক্ষে একশো তো হবে।

—মঁসিয়ে এ্যারোনাক্স, অর্গানের চাবি টিপে স্কচ বাজনার এক অপূর্ব গৎ সৃষ্টি করে তিনি বললেন, 'এটুকু জানবেন, একশো কেন পাপুয়া দ্বীপের সমস্ত অসভ্যেরা আক্রমণ করলেও আমাদের ভয় পাবার কিছু নেই।'

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হল। অসভ্যরা অনেকগুলি ক্যানোতে চড়ে আরও অধিক সংখ্যায় নটিলাসকে ঘিরে ফেলল। এই ক্যানোগুলি গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি। ক্যানোগুলি যত এগিয়ে আসতে লাগল আমি ততই অস্বস্তিবোধ করতে লাগলুম। হঠাৎ তাদের নিক্ষিপ্ত এক ঝাঁক তীর নটিলাসের ওপর বর্ষিত হল।

পরিস্থিতির গুরুত্ব দেখে আমি ক্যাপ্টেনের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিলুম।

—আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলুম, বিনীতভাবে বললুম

ক্যাপ্টেনকে, 'কিন্তু অবস্থা গুরুতর বলেই বাধ্য হয়ে ছুটে আসতে হল আমায়। কয়েকশো অসভ্য চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে আমাদের এবং আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা আক্রমণ চালাবে।'

—ওরা কি ভেলায় করে এসেছে? ক্যাপ্টেন শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তাহলে আমাদের উচিত ভেতরে ঢোকবার মুখগুলোর ঢাকনি বন্ধ করে দেওয়া। একটি বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে এই আদেশটি দিয়ে দিলেন।

—কিন্তু এতেও তো বিপদ সম্পূর্ণ কাটল না। কাল সকালে হাওয়া নেওয়ার জন্যে আমাদের খোলার ঢাকনি খুলতেই হবে। অসভ্যরা যদি রাতভোর প্ল্যাটফর্মে কাটিয়ে জোর করে ভেতরে ঢুকতে চায় তখন তাদের আপনি ঠেকাবেন কি করে?

—ওরা যদি আমাদের জাহাজের ভেতর ঢোকবার চেষ্টা করে তো সে পরে দেখা যাবে। তবে কথা হচ্ছে বিনা দোষে আমি এই নিরীহ লোকগুলির প্রাণ নিতে চাই না।

কথা শেষ করে আমি উঠতে যাচ্ছি ক্যাপ্টেন বললেন, 'কাল দুপুরে ঠিক তিনটে বাজতে কুড়ি মিনিটে নটিলাস টোরেস প্রণালী ত্যাগ করে নতুন যাত্রা শুরু করবে।'

কনসীল আমার ঘরে অপেক্ষা করছিল। আমি তাকে ডাক দিয়ে বললুম, 'ওহে কনসীল, ক্যাপ্টেনকে আমাদের সব সমস্যার কথাই বলেছি। আমি বলি কি, ক্যাপ্টেনের ওপর বিশ্বাস রাখ। নিশ্চিন্তে ঘুম দাও গিয়ে।

—যাক বাঁচা গেল। নিশ্চিন্ত হয়ে বলল কনসীল।

—নেড কোথায়? ঘরের চারদিকে তাকিয়ে আমি জিগ্যেস করলুম।

—সে ক্যাঙারুর মাংস দিয়ে জব্বর এক ভোজ বানাচ্ছে।

পরদিন দুপুর ঠিক তিনটের সময় ক্যাপ্টেন নিমো প্ল্যাটফর্মের ওপর

এসে হাজির হলেন। এবার আমাদের যাত্রার পালা, তিনি বললেন, 'আমি ঢাকনি খোলবার আদেশ দিয়েছি।'

—আর ওই অসভ্যরা? আমার গলার স্বরে আতঙ্ক ফুটল।

—ওরা দলে দলে ভেতরে ঢুকবে এই তো? মঁসিয়ে এ্যারোনাক্স, আপনি আশ্বস্ত হন, ওরা নটিলাসের ভেতর ঢুকতে পারবে না। আপনি বুঝতে পারছেন না? আচ্ছা, আসুন।

আমরা দুজনে মাঝের সিঁড়িটার কাছে গেলুম। জাহাজের নাবিকরা ইতিমধ্যে ঢাকনি খুলতে লেগেছে। ওপর থেকে অসভ্যদের বিশ্রী উল্লাস শোনা যাচ্ছিল।

ঢাকনিটা খুলে ফেলা হল। প্রায় গোটা কুড়ি মুখ একসঙ্গে দেখা গেল। কিন্তু প্রথম যে অসভ্যটা সিঁড়ির রেলিংয়ে হাত দিয়েছিল সে যেন কোন অদৃশ্য শক্তির বলে পেছনে ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তার কাতর চীৎকারে যেন কান ফেটে গেল।

পর পর দশজন এইভাবে ভেতরে আসতে চেষ্টা করল কিন্তু তাদের সকলের ভাগ্যেই জুটল ওই এক শাস্তি।

কনসীল খুব মজা পাচ্ছিল। হঠাৎ নেড উত্তেজিত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু রেলিংটা ছোঁয়ামাত্র সে-ও ছিটকে পড়ল। বাজ পড়েছে আমার ওপর' চীৎকার করে সে বলল।

এইবার বোঝা গেল যে আসলে ওটি রেলিং নয়, বৈদ্যুতিক তার। যে এই রেলিংয়ে হাত দিয়েছে সেই শক খেয়ে পড়েছে ছিটকে। ক্যাপ্টেন নিমোর বুদ্ধির তারিফ করতে হল আরও একবার মনে মনে।

ইতিমধ্যে ভীষণ ভয় পেয়ে দ্বীপের অধিবাসীরা পিছু হঠতে শুরু করেছে। আমরা নেডের শুশ্রূষার দিকে নজর দিলুম।

হঠাৎ নটিলাস দুলে উঠল। বোঝা গেল জোয়ারের জলে যে নতুন বেগ এসেছে তারই শক্তিতে সে আবার চলতে শুরু করেছে। ঘড়িতে তখন ঠিক তিনটে বেজে কুড়ি। অদ্ভুত ক্যাপ্টেনের হিসেব। আস্তে আস্তে বিপদসঙ্কুল টোরেস প্রণালী ছেড়ে আমরা এগিয়ে চললুম সামনে।

আঠারো

নটিলাস এখন দ্রুতগতিতে অর্থাৎ ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে এগিয়ে চলেছে। এই গতির দৌলতে মাত্র দুদিনে আমরা পশ্চিমে কেপ ওয়েলসে পৌঁছে গেলুম। তারও দুদিন পরে আমরা উপনীত হলুম টিমরের সাগরে।

এইখান থেকে দক্ষিণ পশ্চিমমুখো হয়ে নটিলাস ধেয়ে চলল ভারত মহাসাগরের দিকে। ক্যাপ্টেন নিমো কতদূর নিয়ে যাবেন আমাদের ? উনি কি এশিয়ার উপকূলে যাবেন নাকি আবার ফিরে যাবেন ইউরোপের তীরে ? নাকি উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে আণ্টার্টিকার তুষার রাজ্যে যাওয়ারই ইচ্ছে ওঁর ? দেখা যাক সুদূরের ডাক নিয়ে যায় ওঁকে কতদূর।

চারদিন পর নটিলাস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি অনুমান করলুম, জাহাজের ভেতর নিশ্চয় কোন কলকব্জা বিগড়েছে। কিছুক্ষণ পরই আবার যাত্রা শুরু হল তার। এই সময় আমি জলের মধ্যে দেখলুম শুশুক ও প্রায় দশ ফুট লম্বা সোর্ডফিশ। আমার মনে হল শামুক যেমন তার খোলার মধ্যে থাকে তেমনি ভাবে বাস করছিলুম আমরা রাত্রিদিন।

১৮ই জানুয়ারি হঠাৎ আবহাওয়ার দ্রুত অবনতি ঘটল এবং সমুদ্র উঠল ক্ষেপে। ব্যারোমিটারে আসন্ন ঝড়ের সংকেত ফুটে উঠল। প্ল্যাটফর্মের ওপরে দেখলাম ক্যাপ্টেন নিমো চোখে দূরবীন লাগিয়ে তাকিয়ে আছেন দিগন্তের দিকে।

কয়েক মিনিট নিশ্চল ভাবে তাকিয়ে রইলেন তিনি। তারপর সহকারীর সঙ্গে দু একটি কথা বললেন। আমি ক্যাপ্টেন নিমোর দৃষ্টি অনুসরণ করে দিকচক্রবালের দিকে তাকালুম।

কিন্তু অন্তহীন জলের বিস্তার ছাড়া আর কিছুই আমার চোখে পড়ল না।

ঠিক সেই সময় ক্যাপ্টেনের সহকারী সমুদ্রের একটা জায়গার প্রতি ক্যাপ্টেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ক্যাপ্টেনও দূরবীন দিয়ে তাকিয়ে রইলেন সেই দিকে। আমার কাছে এসব হেঁয়ালির মত মনে হল। নিচে নেমে এসে টেলিস্কোপটা নিয়ে দূরের আকাশ ও জল লক্ষ্য করতে লাগলুম।

কিন্তু ভাল করে কিছু দেখবার আগেই হঠাৎ কে সেটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল।

চমকে ঘুরে দাঁড়ালুম আমি। আমার সামনে ক্যাপ্টেন নিমো। কিন্তু এ কোন্ ক্যাপ্টেনকে দেখছি আমি। তাঁর শরীর পাথরের মত শক্ত, চোখ দুটি দপ্‌দপ্ করে জ্বলছে। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

—মঁসিয়ে এ্যারোনাক্স, আপনাকে একটি শর্তের কথা আমি মনে করিয়ে দিতে চাই। জলদগম্ভীর স্বরে বললেন তিনি।

—কোন শর্ত ক্যাপ্টেন?

—যতক্ষণ না আমি আপনাদের মুক্তি দিই, আপনারা একটা জায়গায় বন্দী থাকবেন।

—এখানে আপনার আদেশই শিরোধার্য, কিন্তু একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? বিনীত স্বরে বললুম আমি।

—না, কোন প্রশ্ন নয়।

মুখ নিচু করে আমি ফিরে এলুম আমার কেবিনে। আমার সঙ্গীদের ক্যাপ্টেনের এই আদেশের কথা জানালুম। তারা কিছু বলবার আগেই চারজন লোক আমাদের একটি ছোট কুঠরিতে নিয়ে গেল। সেখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জন্যে প্রাতরাশ এসে পৌঁছল। আমরা খাবার টেবিলে বসে নিঃশব্দে খেতে লাগলুম। নেড এই বন্দীদশায় ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল।

হঠাৎ ঘরের আলো গেল নিভে। নেড সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল এবং একটু পরে কনসীল ঘুমিয়ে পড়তে আমি অবাক হলুম। একটু পরে দেখলুম আমার মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করছে। বুঝলুম যে

আমাদের খাবারের সঙ্গেই ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের বন্দী করেই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি ক্যাপ্টেন নিমো। আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখাও তাঁর কাছে প্রয়োজন বলে বোধ হয়েছে।

আস্তে আস্তে আমার চেতনা লোপ পাচ্ছে। নটিলাস সম্ভবত এখন নিঃশব্দে সমুদ্রের অতলে নেমে যাচ্ছে। তারপর কখন আমার চেতনাকে অবশ করে নেমেছে গভীর ঘুম তা জানতে পারিনি।

উনিশ

ক্যাপ্টেন নিমো সম্বন্ধে কনসীলের ধারণার সঙ্গে আমি একমত হতে পারি নি। কনসীলের মতে ক্যাপ্টেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, যিনি পৃথিবীর কাছ থেকে প্রতারিত হয়ে সমুদ্রে বিচরণ করছেন তাঁর প্রবৃত্তিগুলিকে স্বাধীন ভাবে চরিতার্থ করার জন্যে। আমার মতে এ শুধু ক্যাপ্টেনের চরিত্রের একটা দিক।

বাস্তবিক পক্ষে গত রাতে আমাদের বন্দী করে রাখা, আমার হাত থেকে দূরবীনটি কেড়ে নেওয়া এবং ওষুধ খাইয়ে আমাদের ঘুমপাড়ানো —এসব দেখে আমার মনে এই ধারণাই জন্মেছে যে তাঁর নটিলাসের সৃষ্টি শুধু মানব সমাজকে ত্যাগ করার জন্যে নয়, এক ভয়ানক প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যেও বটে।

এখন আমরা ভারত মহাসাগরের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। এই বিরাট সাগরের জল খুব পরিষ্কার ও স্বচ্ছ। আমার মত যে সমুদ্রকে ভালবাসে সে ছাড়া আর কোন লোকের কাছে এই যাত্রা একঘেয়ে ও বিরক্তিকর বলে মনে হতে পারত। আমি এরই মধ্যে নতুনত্ব ও আনন্দের সন্ধান পেতুম। প্ল্যাটফর্মের খোলা বাতাসে বেরিয়ে, ঘরের ভেতরের জানলা দিয়ে সমুদ্রের সুনীল তরঙ্গ দেখে, লাইব্রেরিতে পড়াশুনো করে ও ডায়েরি লিখে আমার দিন বেশ ভালই কেটে যায়।

আমি দেখি শঙ্খচিল ও বড় বড় ডানাওয়ালা পাখি নানা দেশ থেকে আসে এবং উড়ে উড়ে ক্লান্ত হয়ে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর বসে বিশ্রাম করে। এর মধ্যে আমি কটা সুন্দর এ্যালব্যাট্রস পাখি দেখতে পাই। উড়তে উড়তে জল থেকে ছোঁ মেরে এরা মাছ তুলে নিচ্ছিল। আর দেখি ফির্টন আর লেপটুরি পাখি। ফির্টনদের সাদা আর লাল পালকের মাঝখানে কালো রংয়ের ডানা দুটি ভারী সুন্দর।

অন্য অন্য মাছের মধ্যে আমি দেখতুম অস্ট্রাশিয়ান মাছ। আর্মা-ডিলো যাদের পিঠ কচ্ছপের মত শক্ত আবরণ দিয়ে ঢাকা। চারকোনা অস্ট্রাশিয়ান মাছও দেখলুম। এগুলিকে পাখির মত পোষ মানানো যায়।

২১শে থেকে ২৩শে জানুয়ারি পর্যন্ত নটিলাস চব্বিশ ঘণ্টায় ৫৫০ মাইল পথ গেল। ২৪ তারিখ সকালে নটিলাস কীলিং দ্বীপের ধার ঘেঁষে গেল। যাওয়ার সময় জাল ফেলে আমরা অসংখ্য পলিপি ধরলুম। এই অমূল্য মাছের কয়েকটি ক্যাপ্টেন নিমো তাঁর সংগ্রহ-শালার জন্যে রাখলেন।

.২৫শে জানুয়ারি সমুদ্র একেবারে ফাঁকা। জলের ওপর ল্যাজের জোরালো আঘাত করতে করতে এগিয়ে চলেছে নটিলাস। এই সময় তাকে মৎস্যজাতীয় কোন বিরাট প্রাণী বলে ভুল হওয়া খুব স্বাভাবিক। বিকেল পাঁচটায় আমি আর কনসীল দেখতে পেলুম এক ঝাঁক আরগোনটস। শামুক জাতীয় এই জীবগুলি তাদের আটটি শুঁড়ের ছটিকে ইচ্ছেমত বাড়াতে কমাতে পারে। হঠাৎ কি একটা সংকেত পেয়ে এদের আঁকড়িগুলি গুটিয়ে গেল এবং সমস্ত বাহিনীটি জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে গেল। মানুষের তৈরি কোন রণপোতও এত সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে পারে না।

তার পরের দিন আমরা উত্তর গোলার্ধে প্রবেশ করলুম। এখানে দেখা পেলাম এক ঝাঁক হাঙরের। এদের পিঠের রং খয়েরি, পেট সাদা আর এগারো সারি দাঁত। নেডের হাত নিশপিশ করছিল হার-পুন ছুঁড়ে এদের শিকার করবার জন্যে। কিন্তু নটিলাস গতি বাড়িয়ে সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল।

সন্ধে সাতটার সময় নটিলাস যখন জলে অর্ধেক ডুবে ডুবে চলেছে তখন সমুদ্রকে দেখে মনে হচ্ছে এক দুধ-সমুদ্র। সমুদ্রের সঙ্গে তুলনায় সমস্ত আকাশটা তখন কালো দেখাচ্ছে।

—কি কারণে এই রকম দেখায় হুজুর, কনসীল জিজ্ঞেস করল আমায়। 'জল নিশ্চয় দুধ হয়ে যায় না।'

—আসলে ইনফিউসোরিয়া নামে অসংখ্য উজ্জ্বল পোকা একসঙ্গে থাকলেই সমুদ্রের জল সাদা দেখায়। এই পোকাগুলি কয়েক মাইল জায়গা জুড়ে একটার সঙ্গে আর একটা লেগে থাকে।

মাঝরাতে সমুদ্র আবার তার নিজস্ব রং ফিরে পেল।

২৪শে ফেরুয়ারী নটিলাস যখন জলের ওপর ভেসে উঠল তখন আমার চোখে পড়ল পর্বতশ্রেণী। আমি বুঝতে পারলুম যে আমরা সিংহল দ্বীপটির দিকে যাচ্ছি। মানচিত্র দেখতে দেখতে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'ভাল কথা মঁসিয়ে এ্যারোনাক্স, আপনি নিশ্চয় হাঙর দেখে ভয় পান না ?'

একটু ইতস্ততঃ করে বললুম, 'মানে, আমি ওদের একটু ভয় করেই চলি।'

—আমরা আর ওদের ভয় করি না। আমরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাব এবং পথে হাঙর পেলে তা শিকারও করা যাবে। আচ্ছা, কাল দেখা হবে।

ক্যাপ্টেন বিদায় নিয়ে সেলুন ছেড়ে চলে গেলেন। হাঙর শিকারের কথাটা আমার মনে তোলপাড় লাগিয়ে দিল। সুইজারল্যাণ্ডের জঙ্গলে ভল্লুক শিকার বা ভারতবর্ষের অরণ্যে বাঘ শিকার এক কথা কিন্তু জলের মধ্যে হাঙর শিকার করতে যাওয়ার আগে একবার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে দেখতে হয়। কপালে হাত দিয়ে দেখি আমি রীতিমত ঘামতে শুরু করেছি। এমন সময় নেড আর কনসীল সেখানে এল। আমি বললুম, 'ভাল কথা নেড তুমি হাঙরদের ভয় পাও ?'

—আমি! শুনেই এই কানাডিয়ান যুবকের বুক স্ফীত হয়ে উঠল, 'হারপুন ছোঁড়া যার পেশা, সে করবে হাঙরদের ভয়, ছোঃ!

—আমি কিন্তু জাহাজের ওপর থেকে ওদের হারপুনে গাঁথার কথা বলছি না। আমি বলছি জলে নেমে ওদের শিকার করার কথা।

—খুব ভাল হারপুন হাতে থাকলে সাহসে বুক ঠুকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু কি জানেন, এই হাঙর ভারী বেয়াড়া জীব। এরা যে কোন মুহূর্তে হঠাৎ চিৎ হয়ে শিকারীকে কায়দা করে ফেলতে পারে।

—আর কনসীল, হাঙরদের সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি ?

—আমি খোলাখুলি কথা পছন্দ করি, বলল কনসীল। 'আমার বক্তব্য হচ্ছে আমার মনিব যদি তাদের সামনে গিয়ে লড়তে পারেন তবে আমিই বা কেন পিছিয়ে থাকব।'

কুড়ি

পরের দিন ভোর চারটের সময় নটিলাসের পরিচারকটির ডাকে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। চটপট মুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলে নিচে গিয়ে দেখি ক্যাপ্টেন নিমো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

—চলুন প্রফেসার, আমরা তৈরি। নৌকোয় আমাদের ডুবুরির পোশাক ও অন্যান্য সরঞ্জাম রাখা আছে।

ক্যাপ্টেন ও আমরা তিনজন নৌকোর পিছন দিকে গিয়ে বসলুম। নৌকো দক্ষিণ দিকে চলতে আরম্ভ করল।

নেডের মতে ডাঙা এখান থেকে অনেক দূরে কিন্তু ক্যাপ্টেন জানেন তা খুবই কাছে। ছটার সময় সূর্যালোকে ডাঙা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। একটি দুটি গাছও দৃষ্টিগোচর হল। নৌকো দ্বীপের কাছে এগিয়ে গেল। ক্যাপ্টেনের নির্দেশে নোঙর ফেলা হল।

—আমরা এসে গেছি মঁসিয়ে অ্যারোনাক্স, ক্যাপ্টেন নিমো বলতে লাগলেন, 'সামনের ঘেরা উপসাগরটি দেখছেন ? ওইখানে মুক্তোর ব্যাপারীদের নৌকো এসে ভিড় করে আর ওই জল চুঁড়ে চুঁড়ে ডুবুরিরা মুক্তো খুঁজে বেড়ায়।

আমরা গলা পর্যন্ত রবারের পোশাক পরলুম, পিঠে বাতাস নেবার যন্ত্রটা লাগিয়ে নিলুম। জলে আলো নেবার রুমকফ টি নেব কিনা ক্যাপ্টেন নিমোকে জিগ্যেস করাতে তিনি জবাব দিলেন, 'না, ওটার প্রয়োজন নেই। আমরা এমন কিছু নিচে যাচ্ছি না। যতদূর পর্যন্ত আমরা যাব সূর্যের রশ্মিই আমাদের আলো দিতে পারবে।'

—আর বন্দুক?

—বন্দুক কি হবে! সীসের গুলির চেয়ে ইস্পাতের জোর কি বেশি নয়? এই নিন, এই ছোরাটা আপনার কোমরবন্ধে গুঁজে রাখুন।

এরপর আমরা একে একে সবাই জলের নিচে বালির ওপর দাঁড়ালুম। ক্যাপ্টেন নিমো হাত নেড়ে ইসারা করতে একটা ঢল বেয়ে এগিয়ে আমরা জলের নিচে অদৃশ্য হয়ে গেলুম।

আমাদের পায়ের ওপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মোনোপটেরা মাছরা ভেসে গেল। আড়াই ফুট লম্বা সাপ জাভানিজকেও দেখে আমি চিনতে পারলুম। স্ট্রোমাটিয়ুস জাতীয় মাছেদের দেহ চ্যাপটা ও ডিম্বাকৃতি হয়ে থাকে।

উদীয়মান সূর্যের আলো আস্তে আস্তে জলের নিচের রাজ্য আলোকিত করে তুলছিল। বালির রাজ্য শেষ হয়ে এখন শুরু হল নুড়ি পাথরে ঢাকা দেশ। এই অঞ্চলটি জুফাইট জাতীয় উদ্ভিদ ও শামুকে পরিকীর্ণ। এখানে অন্য উদ্ভিদের মধ্যে ছিল উজ্জ্বল প্যানো-পায়ার আর আকুলাইন।

কিছুক্ষণ চলার পর ক্যাপ্টেন নিমো হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি ভাবলুম এবার হয়ত তিনি ফেরার পথ ধরবেন। কিন্তু না, ইসারায় এক ফাটলের মধ্যে তাঁর পাশে আমাদের লুকিয়ে পড়তে বললেন। তারপর আঙুল দিয়ে তিনি এক জায়গার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

সেদিকে তাকিয়ে আমি দেখলুম যে আমাদের থেকে প্রায় পাঁচ গজ দূরে একটা ছায়া একবার দেখা দিয়ে ফের মিলিয়ে গেল। ঠিক

তক্ষুণি হাঙরদের কথা ভেবে আমার মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। কিন্তু না, সেটি হাঙর বা কোন সামুদ্রিক প্রাণী নয়। সেটি হল একটি মানুষ, এক ভারতীয় জেলে। মুক্তোর জন্যে ঝিনুক সংগ্রহ করতে সে এসেছিল। আমাদের ভেলার ওপর তার ভেলাটা আমি দেখতে পাচ্ছিলুম। তার দু পায়ের মাঝখানে ছিল একটা পাথর। আরো পাঁচ গজ নিচে নেমে সে তাড়াতাড়ি যত পারল ঝিনুক তার থলিতে ভরল।

ডুবুরিটা আমাদের দেখতে পায় নি। পাথরটা আমাদের আড়াল করে রেখেছিল। কিছুক্ষণ ধরে সে নিজের মনে কাজ করে যাচ্ছিল। হঠাৎ দেখি সে খুব আতঙ্কিত হয়ে জলের ওপর ওঠবার চেষ্টা করছে।

আমি তার ভয়ের কারণও দেখতে পেলুম। হতভাগ্য লোকটির ঠিক ওপরে এক বিরাট ছায়া। অতিকায় এক হাঙর ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে মুখব্যাদান করে তেড়ে আসছে তার দিকে।

হাঙরটা তার দিকে তেড়ে যেতেই সে তার ডানা এড়াবার জন্যে একদিকে শুয়ে পড়ল। কিন্তু তার মার সে এড়াতে পারল না। তার বুকের ওপর পড়ল হাঙরের ঘা। লোকটি চিত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

হাঙরটা নতুন করে লোকটিকে আক্রমণ করতে যাবে, ঠিক এই সময় আমি দেখলুম ক্যাপ্টেন নিমো হঠাৎ হাতে ছোরা নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আর কয়েক পা এগিয়ে গেলেন। ঠিক যেই হাঙরটা জেলেটিকে টুকরো টুকরো করতে যাবে সেই সময় ক্যাপ্টেন নিমো তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জেলেটিকে ছেড়ে হাঙর এবার ক্যাপ্টেনের দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু ক্যাপ্টেন সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। হাঙরটা তাঁকে আক্রমণ করা মাত্র তিনি নিচু হয়ে ছোরা বসিয়ে দিলেন তাঁর পেটে। হাঙরটার গা দিয়ে গল্‌গল্‌ করে রক্ত বেরুচ্ছিল। সমুদ্রের রং লাল হয়ে গেল। তারপর আমি দেখলুম ক্যাপ্টেন নিমো হাঙরটার একটা ডানা তুলছেন এবং সেই অবস্থায় বার বার তাকে ছোরা দিয়ে মারছেন কিন্তু চরম আঘাতটা কিছুতেই হানতে পারছেন না।

মনে মনে ক্যাপ্টেনকে সাহায্য করতে চাইছিলুম, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, সাহসে কুলোচ্ছিল না।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন মাটিতে পড়ে গেলেন কেন না জন্তুটা তার বিপুল ভার নিয়ে তাঁকে পর্যুদস্ত করে ফেলেছিল। দু পাটি ঝকঝকে দাঁত দেখে শিউরে উঠলুম আমি। সেই মুহূর্তেই বোধ হয় ক্যাপ্টেনের জীবনের শেষ মুহূর্ত হত যদি না বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়ে নেড হারপুন দিয়ে তাকে প্রবল আঘাত হানত।

অব্যর্থ নেডের লক্ষ্য। ভয়ঙ্কর জীবটি তখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে সমুদ্রের জল কাঁপিয়ে দিচ্ছে। হারপুন গিয়ে বেঁধেছে ঠিক তার হৃৎপিণ্ডে।

নেড ক্যাপ্টেনকে উঠতে সাহায্য করল। ভূমিশয্যা থেকে উঠে ক্যাপ্টেন জেলেটার দড়ি কেটে দিলেন। তারপর তাকে দু হাতে ধরে ওপরে উঠতে লাগলেন। আমরা তিনজনেই তাঁকে অনুসরণ করে জেলেটার নৌকায় গিয়ে উঠলুম। ভাগ্য আজ আমাদের এক রোমাঞ্চ-কর নাটকের অভিনয় দেখিয়ে সকলের প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছে।

ক্যাপ্টেন ও কনসীলের সেবায় লোকটি অল্পক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠল। প্রথম চোখ খুলেই শিরস্ত্রাণ পরা চারজন লোক দেখে সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ক্যাপ্টেন যখন তাঁর পকেট থেকে ছোট থলি-ভর্তি মুক্তো তার হাতে দিলেন তখন কৃতজ্ঞতায় তার দুটি চোখ সজল হয়ে উঠল। তারপর ক্যাপ্টেন নেডকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানালেন।

—এ প্রতিদান দেওয়া ছিল আমার কর্তব্য, নেড বলল, 'কেন না আপনিও আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।'

এই কথা শুনে ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে একটু হাসি খেলে গেল।

নটিলাসে ফিরে যেতে যেতে দুটি জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট হল। এক, ক্যাপ্টেন নিমোর অসাধারণ সাহস আর দ্বিতীয়টি হল যে মানব সমাজ ছেড়ে আজ তিনি সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই সমাজের মানুষের প্রতি তাঁর গভীর দরদ।

যখন আমি তাঁকে আমার এই ভাবনার কথা জানালুম তখন আবেগ-মিশ্রিত গলায় তিনি বললেন, এই ভারতীয়টি হচ্ছে একটি নির্যাতিত দেশের অধিবাসী, এবং আমি চিরকালই ওদের একজন হয়ে থাকব।

একুশ

২৯শে জানুয়ারী সিংহল আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে মুছে গেল। ভাস্কো-ডা-গামার আবিষ্কৃত কিলটান দ্বীপটিকেও নটিলাস ছুঁয়ে গেল। এরপর আরব ও ভারতবর্ষের মধ্যে দিয়ে ওমান সাগর অভিমুখে যাত্রা। ক্যাপ্টেন নিমো কোন্ দিকে নিয়ে চলেছেন আমাদের কিছু বোঝার উপায় নেই।

পারস্য উপসাগর থেকে বাইরে বেরুনোর তো কোন পথ নেই। আমাদের সঙ্গীদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনার ফাঁকে নেড বলল এই কথা।

—তা যদি না হয়, তাহলে আমরা আবার বেরিয়ে আসব। আর পারস্য উপসাগরে যাবার পর নটিলাসের যদি লোহিত সাগরে যাবার দরকার হয় তার জন্যে বাবেলমাণ্ডেব প্রণালী রয়েছে, বললুম আমি।

—কিন্তু ইউরোপে যাবার পক্ষে লোহিত সাগর খুব একটা ভাল পথ নয়।

—আমরা যে ইউরোপে ফিরে যাচ্ছি সে কথা তোমায় কে বলল ?

—তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

—আমার তো মনে হয় আমরা উত্তমাশা অন্তরীপের দিকে চলেছি।

—তারপর সেখানে পৌঁছে ?

—উত্তমাশা অন্তরীপে পৌঁছনোর পর আমরা অতলান্তিকের যে অংশ এখনও দেখিনি সেই অংশে প্রবেশ করব। নেড, তুমি কি

এখনই হাঁপিয়ে উঠলে ? জলের তলায় এমন বিচিত্র জগৎ দেখে ভাল লাগছে না তোমার ? আমি তো ভাই এ যাত্রার শেষটুকু না দেখা পর্যন্ত স্বস্তি পাব না। বললুম আমি।

পরের দিন নটিলাস এডেনের কাছে গেল। দূর থেকে শহরের আটকোণ মিনারগুলি দেখতে পাওয়া গেল।

ক্যাপ্টেন নিমো এখান থেকেও পেছনে ফিরলেন না। এরপর আমরা প্রবেশ করলুম বাবেলমাণ্ডের প্রণালীতে। সেইদিনই দুপুরে আমরা লোহিত সাগরে এসে পৌছলুম। এইবার নটিলাস আফ্রিকার তীরভূমির দিকে এগিয়ে গেল। সেলুনের জানলা দিয়ে এখানকার স্ফটিকের মত স্বচ্ছ জল, প্রবাল স্তূপ ও সবুজ রংয়ের শষ্পে আচ্ছাদিত বড় বড় পাথর দেখতে পেলুম। তেহামার উপকূলের কাছে দেখলুম জলের যাট ফুট ওপরে জুফাইটিস উদ্ভিদ তার পত্রপুটের মায়াজাল রচনা করেছে।

এখানে জাল ফেলে ধরা হল সুন্দর ক্যারাঙ্কসেস। এদের গায়ে থাকে কালো, নীল ও হলদে রংয়ের সাতটি ডানা আর সোনালি, রুপোলী রংয়ের আঁশ। এ ছাড়া ধরা হল হলদে রংয়ের মুলেট, গোবি ও আরো হাজার রকমের মাছ।

৯ই ফেব্রুয়ারী নটিলাস লোহিত সাগরের সবচেয়ে প্রশস্ত অংশের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। সেদিন দুপুরবেলায় ক্যাপ্টেন নিমো যখন প্ল্যাটফর্মের ওপর উঠে এলেন তখন আমি সেখানে ছিলুম। আমাকে দেখতে পেয়ে তিনি আমাকে একটি চুরুট দিলেন ও লোহিত সাগরের ধারে অবস্থিত প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করেছি কিনা জিগ্যেস করলেন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি জানালুম, উদ্ভিদ, জীবজন্তু এবং স্থাপত্য সবই আমি দেখেছি। ঝড়-ঝঞ্ঝার দিক থেকে এ সাগরটির বেশ দুর্নাম আছে। প্রাচীনকালেও এই নিয়ে এর অখ্যাতি ছিল।

—ছিলই তো, ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, গ্রীক বা ল্যাটিন ইতিহাসবিদরা কেউই এর সুখ্যাতি করেন নি। আরবী ইতিহাসবিদ এড্রিমি

বলেছেন যে ঝড়ে এখানে বহু জাহাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং এখানে রাত্রে জাহাজ চালাতে সাহস করে না।

—অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে যে এইসব ঐতিহাসিকরা নটিলাসের মত কেউই ডুবোজাহাজ চড়ে লোহিত সাগর পেরোন নি। আমি বললুম।

—তা সত্যি। আর দেখুন, আধুনিক জাহাজও কতদিন পরে উন্নত হতে পেরেছে। কে জানে আর একখানা নটিলাস তৈরি করতে হয়ত আরও একশো বছর লেগে যাবে।

—আচ্ছা ক্যাপ্টেন, আপনি তো এই সমুদ্রটিকে অনেকদিন ধরেই জানেন। এর নামের উৎস কি তা কি আপনার জানা আছে?

—এ বিষয়ে অনেকগুলি মত আছে, ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, একজন প্রাচীন ইতিহাসকার বলেন যে মুসার পেছু ধাওয়া করে ফারাও যখন এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন মুসার কথায় সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হয়ে ফারাও এবং তাঁর বিপুল বাহিনীকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেই কারণে এই সমুদ্রের নাম হয়েছে লোহিত সাগর।

—এটি কল্পনা-নির্ভর ব্যাখ্যা আমি বললুম, আমি আপনার ব্যক্তিগত মত শুনতে চাই।

—আমার মতে জল এইরকম লাল দেখানোর কারণ হচ্ছে এক-রকম অতি ক্ষুদ্র লাল কীটের অস্তিত্ব। ট্রিকোডেসমিয়া নামে একরকম ছোট ছোট উদ্ভিদ থেকে এদের সৃষ্টি হয়।

—আচ্ছা ক্যাপ্টেন, একটু আগে আপনি যে ফারাও এবং মিশরীয় বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কথা বলছিলেন আপনি নিজে লোহিত সাগরে তার কোন নিদর্শন দেখেছেন?

—না। কেন না সুয়েজ যোজকের একটু ওপরে যে জায়গা দিয়ে মুসা এবং তাঁর অনুচরেরা গিয়েছিলেন সে জায়গাটি এখন বালি চাপা পড়ে গেছে। সেখান দিয়ে নটিলাসের যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

একটু চুপ করে থেকে ক্যাপ্টেন বললেন, 'দুর্ভাগ্য বশত আমি আপনাকে সুয়েজ খাল দিয়ে নিয়ে যেতে পারব না। কিন্তু তবু

পরশু ভূমধ্যসাগরে পৌঁছেই আপনি পোর্ট সৈয়দ বন্দরটি দেখতে পাবেন।

—ভূমধ্যসাগর! আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

—হ্যাঁ, কেন আপনি কি অবাক হচ্ছেন?

—নিশ্চয়, কেন না আমি কল্পনা করতে পারছি না যে পরশু আফ্রিকা ঘুরে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছতে আপনি কত জোরেই না নটিলাসকে চালাবেন।

—আমি যে আফ্রিকা এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যাব তা আপনাকে কে বলল?

—তাছাড়া আর পথ কই।

—সুয়েজ যোজকের ওপর দিয়ে না হলেও নিচ দিয়ে যাওয়া তো সম্ভব, ক্যাপ্টেন আমার বিমূঢ় অবস্থাটা উপভোগ করতে করতে বললেন, সুয়েজ যোজকের নিচে একটি ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গ আছে। এর নাম আরব সুড়ঙ্গ। এটি দিয়ে আমি পেলুসিয়াম উপসাগরে পৌঁছব।

পরের দিন নটিলাস জলের নিচে ডুব দিল। তারপর দুপুরের দিকে সমুদ্র ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় উঠে এল ওপরে।

নেড আর কনসীলের সঙ্গে আমি প্ল্যাটফর্মের ওপর বসেছিলুম। পূর্ব উপকূল তখন কুয়াশায় একাকার। হঠাৎ নেড সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'ওখানে কিছু একটা দেখতে পাচ্ছেন কি প্রফেসর?'

—না তো। তারপর ভাল করে ঠাহর করে দেখে বলে উঠলুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো জলের ওপর কালো রংয়ের লম্বা মত কী যেন একটা।

আমাদের কাছ থেকে ওই রাস্তাটির দূরত্ব তখন এক মাইলের কম। আসলে আমরা দেখেছিলুম একটি অতিকায় ডিউগং (স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণী বিশেষ)।

নেড খুব আগ্রহ ভরে দেখছিল। তক্ষুনি হারপুন ছোঁড়বার জন্যে হাত নিশপিশ করছিল তার।

ঠিক এই সময় ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে এলেন। নেডের মনের ভাব বুঝতে পেরে তিনি বললেন, 'তুমি ওটাকে মারতে পার নেড, তবে দেখো তাক ফসকে যায় না যেন।'

সাতজন নাবিক তক্ষুনি একটি দড়িবাঁধা হারপুন এনে সেখানে হাজির করল। নৌকোটিকে জাহাজ থেকে খুলে জলে নামানো হল। নেড, আমি আর কনসীল নৌকোয় গিয়ে বসলুম। ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমার শুভেচ্ছা রইল আপনাদের জন্যে।'

নৌকো প্রথমে বেশ জোরে চালিয়ে জন্তুটির কাছে গিয়ে তার গতি কমিয়ে দেওয়া হল। হাতে হারপুন নিয়ে নেড ল্যাণ্ড নৌকোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে নেডের শিকার পর্ব লক্ষ্য করতে লাগলুম।

জন্তুটির বিশেষত্ব হল হাতির দাঁতের মত দুটি বড় এবং ধারালো দাঁত। লম্বায় ডিউগংটা হবে প্রায় চব্বিশ ফুট।

নৌকো ডিউগংটার মাত্র ছ'গজের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। পাকা হাতে হারপুনটা বাগিয়ে ধরে সজোরে ছুটল নেড ল্যাণ্ড। তীরবেগে ছুটে গেল হারপুন তার লক্ষ্যের দিকে।

কিন্তু তার আগেই একটা হিস্ হিস্ শব্দ তুলে ডিউগংটা চক্ষের নিমেষে অন্তর্হিত হয়েছে। হারপুনটা সোজা গিয়ে পড়ল জলে।

—ছি, ছি। নেড হায় হায় করে উঠল। আমার তাক ফসকে গেছে।

নৌকো আবার তার পেছন পেছন চলল। কিন্তু এবারও নেড হারপুন দিয়ে তাকে বিঁধতে পারল না। হারপুন ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জলে ডুব দিয়ে আমাদের হাত এড়িয়ে যায়।

নেডের মাথায় তখন আগুন জ্বলছে।

আমরা যখন হাল ছেড়ে দিয়েছি তখন ঘটল এক নাটকীয় ঘটনা। হঠাৎ জন্তুটা তেড়ে এল আমাদের দিকে। কুড়ি ফুট দূর থেকে আচমকা এক লাফ দিয়ে সে পড়ল আমাদের নৌকোর ওপর।

নৌকো তার ভার সামলাতে না পেরে কাত হয়ে পড়ল। হালের

মাঝি খুবই দক্ষ, আশ্চর্য কায়দায় নৌকোকে সোজা করে নিল সে। এদিকে নেড দাঁতে দাঁত চেপে ক্রমাগত জন্তুটাকে আঘাত করে চলেছে। কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না কিছুতেই।

কিন্তু তারপর একসময় নেড চরম আঘাত হানল এবং এই রোমাঞ্চকর দৃশ্যের অবসান ঘটল। গলদঘর্ম হয়ে প্রায় ২০,০০০ পাউণ্ড ওজনের জন্তুটিকে নৌকোয় চাপিয়ে আমরা নটিলাসের দিকে রওনা দিলুম।

পরের দিন শিকার করলুম সামুদ্রিক সোয়ালো পাখি আর হাঁস। আস্তে আস্তে রাত ঘনাতে দূরে মাঝে মাঝে পেলিক্যান ও অন্যান্য রাতজাগা পাখিদের ডাক শুনতে পাওয়া গেল।

আমার হিসেব মতন আমরা তখন সুয়েজের কাছাকাছি এসে গেছি। সেলুনের জানলা দিয়ে আমরা তখন বৈদ্যুতিক আলোর সাহায্যে সুন্দর পাথরের স্তরগুলি দেখতে পাচ্ছিলুম।

প্রায় এক মাইল দূরে রাত্রির মধ্যে একটা ম্লান আলো দৃষ্টিগোচর হল।

—ওটা একটা ভাসমান আলোকস্তম্ভ। কে যেন আমার পাশ থেকে বলে উঠল।

আমি চমকে ফিরে তাকালুম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন নিমো।

—ওটা হল সুয়েজের ভাসমান আলোকস্তম্ভ। ক্যাপ্টেন বললেন, 'সুয়েজে প্রবেশ করতে আর বেশি দেরি নেই। এখন চলুন মঁসিয়ে এ্যারোনাক্স নিচে নামবেন, কেন না নটিলাস এখন জলের নিচে নামবে।'

আমরা দু'জন সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলুম। ক্যাপ্টেন নিমো চালকের ছোট ঘরটির মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, 'এইবার আমরা সুড়ঙ্গয় ঢুকব।'

আমি নিঃশব্দে দেখতে লাগলুম একটা বিরাট খাড়াই দেওয়ালের পাশ দিয়ে আমাদের ডুবোজাহাজ চলেছে। এই দেওয়ালটি এক

বিস্তৃত তটভূমির অংশ। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই দেওয়ালটির পাশ দিয়ে নটিলাস চলল।

ক্যাপ্টেন এবার নিজের হাতে চাকা ধরলেন। চারিদিকে কালো রংয়ের পাথর দেখতে পাচ্ছিলুম। দু'পাশে জলের গর্জন শোনা যাচ্ছে। আমার বুক কাঁপছিল।

প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে ক্যাপ্টেন চাকা থেকে হাত তুললেন। আমার কাছে এসে বললেন, 'এই দেখুন ভূমধ্যসাগর।'

বাইশ

পরের দিন সকালে নটিলাস জলের ওপর ভেসে উঠল। আমি প্ল্যাটফর্মের আসার একটু পরেই নেড আর কনসীলও ওপরে উঠে এল।

—তারপর প্রকৃতিবিজ্ঞানী মশাই, বিদ্রূপের সুরে বলল নেড, 'আপনার ভূমধ্যসাগর কই?'

—আমরা এখন তারই ওপরে ভাসছি ভাই?

—কী বলছেন হুজুর, কনসীল অবাক হয়ে বলল, 'এই এক রাত্তিরের মধ্যে নটিলাস ভূমধ্যসাগরে চলে এসেছে!'

—হ্যাঁ! কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা অতি দুর্গম সুয়েজ যোজকটি পেরিয়ে এসেছি।

—আমি এসব বিশ্বাস করি না, জোর গলায় বলে উঠল নেড।

—তাহলে আমি বলব তুমি ভুল করছ নেড, আমি বললুম, 'কেন না একটু ভাল করে তাকালেই তুমি পোর্ট সৈয়দ দেখতে পাবে দূরে।'

নেড খুব ভাল করে সামনের দিকে তাকাল। মনে হল এবার তার সন্দেহ ঘুচেছে। আমার দিকে ফিরে সে বলল, 'সত্যি আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার ক্যাপ্টেনের বাহাদুরি আছে বলতে হবে।

কিন্তু এখন যদি আমাদের ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলেন তবে বড় ভাল হয়।'

—তুমি কি বলতে চাইছ নেড?

—আমি বলতে চাই যে এখন আমরা ইউরোপে এসে পড়েছি এবং ক্যাপ্টেন নিমো আবার তাঁর খেয়াল খুশী মত আমাদের মেরু সাগর বা ওশিয়ানিয়ায় টেনে নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। আমি এখন নটিলাস থেকে বিদায় নিতে চাই।

নেডের মনোভাব জানার জন্যে আমি তাকে প্রশ্ন করলুম, 'আচ্ছা নেড, সত্যি করে বলো দিকি নটিলাসে থাকতে কি তোমার বিরক্তি ধরে গেছে?'

নেড একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি সমুদ্রের নিচে দিয়ে এইভাবে বেড়াতে আমার খারাপ লাগে না। তবে কথা হচ্ছে, বেড়ানো তো ঢের হয়েছে. এবার এর শেষ হওয়া উচিত?'

—শেষ তো একদিন হবেই। ধরো আর ছ'মাস—

—ছ'মাস, নেড আঁতকে উঠল, 'এতদিন এই জাহাজে আটকে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না প্রফেসর।' তারপর একটু ভেবে নিয়ে সে বলে, 'ভাল একটা সুযোগ পেলে আমাদের তা ছাড়া উচিত হবে না।'

—ভাল সুযোগ বলতে তুমি কি বলতে চাইছ?

—মানে, রাত্রের দিকে নটিলাস যখন ইউরোপের কোন উপকূলের কাছাকাছি আসবে তখন···আমাকে ওই নৌকোটার সাহায্য নিতে হবে। ওই নৌকো চালাতে আমি খুব ওস্তাদ।

—আমার মনে হয় এরকম সুযোগ তুমি কখনই পাবে না। কেন না ক্যাপ্টেন নিমো জানেন আমরা আমাদের হারানো স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার চেষ্টা সব সময়ই করছি সুতরাং তিনি সব সময়ই খুব সতর্ক থাকবেন বিশেষ করে ইউরোপের তীর দিয়ে যাওয়ার সময়।

—সে দেখা যাবে। মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল নেড।

—যেদিন বুঝবে যে সুযোগ এসেছে, আমি গলা নামিয়ে বললুম, সেদিন আমাকে বোলো, আমি সানন্দে তোমার সঙ্গ নেব।

এ সময় আমরা প্রাচীন ক্রীট দ্বীপের দিকে যাত্রা করছিলুম। একদিন ক্যাপ্টেন সেলুনে ঢুকে জানলাগুলি খুলে দিতে বললেন। সাধারণত এরকম নির্দেশ তিনি দেন না। কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে জলের দিকে চেয়ে তিনি চলে গেলেন। আমি এই অঞ্চলের মাছ-গুলিকে চিনতে চেষ্টা করছিলুম। আমি দেখলুম ফসফরাস জাতীয় মাছ জলে ঘোরাফেরা করছে। মিশরীয়দের কাছে এই মাছ খুব পবিত্র, এই মাছ স্রোতে ভেসে এলে ওরা নানারকম উৎসব শুরু করে দেয়।

আর দেখতে পেলুম এ্যানথিই নামে একরকমের মাছ। এই কথাটির অর্থ ফুল ; মাছগুলির বর্ণ বৈচিত্র্য ফুলের কথাই মনে করিয়ে দেয়। আমি এদের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলুম না।

এই সময় ক্যাপ্টেন নিমো এসে আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। ঘরের বাঁ দিকের জানলার কাছে রাখা একটি সিন্দুক খুললেন ক্যাপ্টেন। তারপর তার ভেতর থেকে বার করলেন এক এক করে অনেকগুলি সোনার বাট। অবাক হয়ে আমি ভাবলুম এত সোনা ক্যাপ্টেন যোগাড় করলেন কোথা থেকে। আমি আন্দাজ করলুম যে প্রায় দু লক্ষ পাউণ্ড দামের সোনা রয়েছে সেখানে।

সিন্দুকটি বেশ ভালভাবে এঁটে ক্যাপ্টেন তার ডালায় একটি ঠিকানা লিখলেন। তারপর চারজন লোক সিন্দুকটাকে ঘরের বাইরে নিয়ে গেল। তারপর শুনলুম কপিকল লাগিয়ে সেটিকে ওপরে তোলার শব্দ।

খুব চিন্তামগ্ন মন নিয়ে আমি আমার ঘরে ফিরে এলুম। চোখে ঘুম নেই শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম এই লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা কোন্ দেশে পাঠানো হল ? কাকেই বা ক্যাপ্টেন তাঁর বার্তা লিখে পাঠালেন ?

পরের দিন কনসীল আর নেডকে এই ঘটনা জানালুম। ওরাও শুনে খুব উত্তেজিত বোধ করল।

—এত দামের সোনা কোথায় পাঠালেন ভদ্রলোক ? নেড প্রশ্ন করল বিস্ময়ের সঙ্গে।

সেইদিনই ভোরের দিকে হঠাৎ আমার খুব গরম বোধ হতে লাগল। এত গরম যে কোটটা খুলে ফেলতে বাধ্য হলুম আমি। ম্যানোমিটারের দিকে তাকিয়ে বুঝলুম আমরা এখন ষাট ফুট নিচে। ঠিক এইরকম অবস্থায় তো এতটা গরম হতে পারে না।

—জাহাজে কি আগুন লাগল নাকি? নিজের মনেই প্রশ্ন কলুরম আমি।

আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসব এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে প্রবেশ করে বললেন, 'আমরা এখন ফুটন্ত জলের ওপর দিয়ে চলেছি।'

—এ আপনি কি বলছেন! আমি চেঁচিয়ে উঠেছি প্রায়।

—বাইরে তাকিয়ে দেখুন। শান্ত স্বরে বললেন তিনি।

জানলা খুলে আমি বাইরে তাকিয়ে অবাক হলুম। জলের রং সাদা এবং তা থেকে গন্ধকের ধোঁয়া উঠছে। পাত্রে যেমন জল ফোটে তেমনি টগবগ করে ফুটছে সমুদ্রের জল।

—আমরা কোথায়?

'সানটোরিন দ্বীপের কাছে', ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, 'নিয়া ক্যামেন্নি আর পালি ক্যামেন্নির মাঝখানে যে খাল ঠিক সেইখানে নটিলাস রয়েছে। পৃথিবীর নিচে যে আগুন আছে তা সব সময় ওপরের পৃথিবীতে ভাঙাগড়া চালিয়ে যাচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন দ্বীপ, লুপ্ত হচ্ছে প্রাচীন ভূখণ্ড। ১৮৬৬ সালে জন্ম নেয় একটি নতুন দ্বীপ যার নাম রাখা হয়, জর্জ আইল্যাণ্ড। কয়েক মাস পরে দ্বীপটি আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। পর পর সৃষ্টি হয় আফ্রোয়েসর ও রেকা দ্বীপ। এটি কালো রংয়ের লাভা দিয়ে তৈরি।

ম্যাপ দেখে আমি কাচের কাছে গেলুম। নটিলাস আর চলছে না। গরম অসহ্য হয়ে উঠেছে। গন্ধকের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠেছে। আগুনের লাল শিখায় বৈদ্যুতিক আলো নিষ্প্রভ।

—এই ফুটন্ত জলে আর বেশিক্ষন থাকলে আমি বাঁচব না। ছটফট করতে করতে বললুম আমি।

ক্যাপ্টেনের আদেশে নটিলাস অগ্নিকুণ্ডের কাছ থেকে সরে এল। হঠাৎ আমার মনে হল নেড যদি সমুদ্রের এই জায়গাটা দিয়ে পালাবার মতলব করত তাহলে আমাদের তিনজনকে নির্ঘাত পুড়ে মরতে হত।

তেইশ

অতলান্তিকে আসার আগে আমাদের পেরিয়ে আসতে হল ঘন নীল ভূমধ্যসাগর। এর ধারে কমলালেবুর গাছ, এর বাতাসে চিরহরিৎ সুগন্ধ গুল্মের সুরভি আর চারপাশে কঠিন পর্বতের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। ভূমধ্যসাগরের ওপর রয়েছে নির্মল বাতাস আর নিচে রয়েছে চাপা আগুন।

এ কথাটা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম যে ভূমধ্যসাগরের চার-পাশের দেশগুলির সম্বন্ধে ক্যাপ্টেনের ধারণা বিশেষ ভাল নয়। এখানকার বাতাস আর সমুদ্রের ঢেউ তাঁর কাছে অনেক স্মৃতি বয়ে নিয়ে এল।

এ সময় নটিলাসের গতি ছিল ঘণ্টায় পঁচিশ মাইল। বলা বাহুল্য নেড ল্যাণ্ডকে এ সময় জাহাজ থেকে পালানোর পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়েছিল। এখন নটিলাস থেকে নৌকো নিয়ে সমুদ্রে ভাসার মানে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফ মারা। তাছাড়া আমাদের জাহাজ শুধু রাত্রেই একবার বাতাস নেওয়ার জন্যে ভেসে উঠত, বাকি সময়টা তার কাটত জলের নিচে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী আমরা জিব্রাল্টার প্রণালী পৌঁছলুম। এখানে জলের দুটি স্রোত। একটি উচ্চ ও অপরটি নিম্ন। এক পলকের জন্যে আমরা হারকিউলিসের সুন্দর মন্দিরটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেলুম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা ভূমধ্যসাগর ছাড়িয়ে পড়লুম সেই সুবিস্তৃত মহাসমুদ্রে যা লম্বায় ন হাজার এবং চওড়ায় দু হাজার সাতশো মাইল। এর মধ্যে এসে পড়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম নদীগুলি

যার মধ্যে মিসিসিপি, আমাজন ও জার্মানীর রাইন অন্যতম। এই মহাসাগরে পৃথিবীর সমস্ত দেশের জাহাজ তাদের পতাকা বহন করে চলাচল করে।

তীব্রবেগে নটিলাস জল ভেদ করে এগিয়ে চলল। সাড়ে তিন মাসের মধ্যে এই দ্রুতগামী ডুবো-জাহাজটি পৃথিবীর পরিধির চেয়ে ৩৪ হাজার মাইলের এই দূরন্ত অতিক্রম করে এসেছে। এখন আরো এগিয়ে কোথায় চলেছি আমরা ? কোন অজানায় গিয়ে শেষ হবে এর যাত্রা !

—নেড, তোমার মনের কথা বুঝতে পেরেছি আমি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির সুরে বলি আমি, 'নটিলাস যখন ভূমধ্য সাগরে ছিল তখন পালানোর চেষ্টা করলে নিতান্ত বোকামির কাজ করা হত। এতটা হতাশ হবার মত কিছু হয় নি, আমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, আমাদের সুযোগের সন্ধানে থাকতে হবে। ফ্রান্স আর ইংলণ্ডও আর খুব দূরে নেই। এইসব জায়গাতেও আমরা আশ্রয় পেতে পারি। ঈশ্বরে বিশ্বাস রেখো ভাই।'

নেড আমার দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে তাকাল। একটু পরে সে বলল, 'আজই রাত্রে আমার ইচ্ছে পূর্ণ হবে।'

একথা শুনে আমি বেশ চমকে গেলুম। বস্তুতপক্ষে এরকম একটা কিছু করার ইচ্ছে আমার মনের মধ্যেও উঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু সাহসের অভাবে কোন কথা প্রকাশ করতে রাজী হচ্ছিলুম না।

—আপনি একটা সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে রাজী হয়েছিলেন। আজ সেই সুযোগ উপস্থিত, আস্তে আস্তে বলল নেড, 'আজ আমরা স্পেনীয় তটভূমি থেকে কয়েক মাইল দূরে থাকব। আজ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং ঝোড়ো বাতাস বইছে। আপনি আমায় বলেছিলেন মঁসিয়ে এ্যারোনাক্স, আমার ওপর আপনার বিশ্বাস আছে।'

—আজ রাত ন'টার সময়, আমায় চুপ করে থাকতে দেখে নেড বলল, 'কনসীলকে আমি আগেই বলেছি। এই সময় ক্যাপ্টেন নিমো

তাঁর ঘরে থাকেন। নাবিক ইঞ্জিনিয়াররা কেউই আমাদের দেখতে পাবে না। কনসীল আর আমি মাঝখানের সিঁড়িটা বেয়ে ওপরে উঠব আর আপনি লাইব্রেরীর মধ্যে আমাদের সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকবেন। দড়িদড়া, মাস্তুল সব ভেলায় গোছানো থাকবে। সুতরাং আপনি বুঝতে পারছেন, সব ব্যবস্থা সারা। আজকের রাতটার মত এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে। আচ্ছা আসি, আবার রাত্রে দেখা হবে।'

আমি প্রায় বোবার মত দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার মন বলছিল এইরকম একটা কাজ করার আগে বেশ ভালভাবে চিন্তা করে নেওয়া দরকার। তবে নেডের কথাও ঠিক। এটা একটা সুযোগই বটে। আমি যে কথা দিয়েছি সে কথা ফিরিয়ে নিয়ে আমার সঙ্গীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার কোন অধিকার আমার নেই।

সেদিন আমি সারাক্ষণ প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটালুম। একদিকে স্বাধীনতা ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সমুদ্রতল নিয়ে গবেষণা শেষ করার আগ্রহ। কখনও কল্পনা করছিলুম যে সঙ্গী দুজনকে নিয়ে কোন এক নিরাপদ দেশে গেছি আবার কখনও ভাবছিলুম যদি হঠাৎ কোন কারণে নেডের এই পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায় তবে আমি বেশ নটিলাসে থাকতে পারি।

আমার খাবার যথারীতি আমার ঘরে দিয়ে গেল। তখন বাজে সাতটা। নেডের সঙ্গে দেখা হতে তখনও দু ঘণ্টা বাকি। আমার উত্তেজনা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। ক্যাপ্টেন নিমো যখন এই পরিকল্পনার কথা জানতে পারবেন তখন এটা কি ভাবে নেবেন কে জানে। হয়ত বিরক্ত হবেন বা আমি চলে গেছি জেনে হয়ত দুঃখ পেতে পারেন।

সেলুন পেরিয়ে আমি ক্যাপ্টেনের ঘরের কাছে এলুম। দরজাটা খোলা দেখে অবাক হলুম আমি। সঙ্গে সঙ্গে পেছিয়ে এলুম আমি কেন না ক্যাপ্টেন নিমো ঘরে থাকলে দেখে ফেলতে পারেন আমায়। কিন্তু ঘর একেবারে ফাঁকা।

হঠাৎ ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল। নিজের ঘরে ফিরে আমি

জামা-কাপড় পরে নেডের সংকেতের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু শোনা যায় জল কেটে নটিলাসের চলার শব্দ। ভয়ে আমার চেতনা আচ্ছন্ন ছিল। তখন যদি কেউ আমাকে বলত হঠাৎ নেড তার অভিযান বাতিল করার সংকল্প করেছে তাহলে আমার মত সুখী কেউ হত না।

হঠাৎ কেমন একটা ধাক্কা লাগল। বুঝলুম যে সমুদ্রের তলায় গিয়ে নটিলাস থেমে গিয়েছে। এখনও নেডের কাছ থেকে কোন সংকেত এসে পৌঁছয় নি। আমার মন বলছে যে কোথাও কিছু গোলমাল হয়ে গিয়েছে।

ঠিক সেই সময় সেলুনের দরজা খুলে ক্যাপ্টেন বেরিয়ে এলেন এবং আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, 'আরে এই তো আপনি। আপনাকে আমি কখন থেকে খুঁজছি। আপনি স্পেনের ইতিহাস জানেন?'

—খুব সামান্য। আমি উত্তর দিলুম। নিজের দেশের ইতিহাস মানুষের মুখস্থ থাকে, কিন্তু আমার তখন মনের অবস্থা এমন যে জানা জিনিসও মনে পড়ছিল না।

—বেশ, শুনুন আপনাকে একটা মজার গল্প বলি, তারপর ক্যাপ্টেন ধীরে সুস্থে আমাকে শোনাতে লাগলেন, ষোড়শ লুই তাঁর নাতি ডিউক অব আঞ্জুকে কেন পাঠিয়েছিলেন অতলান্তিকে। উদ্দেশ্য ছিল, পিরে-নিজদের তাঁর দমনে আনা, ইতিমধ্যে হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়ার রাজাদের সঙ্গে স্পেনের রাজ শক্তির সম্পর্কের অবনতি ঘটে। স্পেনের বৃহৎ জাহাজগুলি তখন আমেরিকা থেকে সোনা বোঝাই করে নিয়ে আসে। ১৭০২ সালের কথা। একটি স্পেনীয় নৌবহর এসে পৌঁছল ডিগো উপসাগরে। কনভয়টির যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু কাডিজ বন্দরে।

কাডিজের ব্যবসায়ীদের একটা নিয়ম ছিল যে ডিগো উপসাগরে যত জাহাজ আসবে সব তারা পাবে। অর্থাৎ ডিগোতে এই সোনার বাটগুলি খালাস করার অর্থ তাদের বঞ্চিত করা। এই থেকে শুরু হল লড়াই। একদিকে স্পেন, যার পেছনে ফরাসী নৌবহরের এ্যাড-

মিরাল স্যাটো রেনড অন্যদিকে হল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের সম্মিলিত শক্তি। স্যাটো রেনড অসীম সাহসের সঙ্গে লড়লেন, যখন তিনি দেখলেন যে ওই সোনা ইংলণ্ডের হাতে চলে যাচ্ছে তখন তিনি আগুন ধরিয়ে সব জাহাজগুলি ডুবিয়ে দিলেন। জাহাজগুলির সঙ্গে সলিল সমাধি লাভ করল প্রচুর মহামূল্য সম্পদ।

আমরা এখন সেই ডিগো উপসাগর দিয়ে চলেছি, তাঁর বিবৃত কাহিনীর মধ্যে অল্পক্ষণের বিরতি দিয়ে ক্যাপ্টেন আমাকে তাঁর সঙ্গে আসতে বললেন। ক্যাপ্টেনের সেলুনটা অন্ধকার, কিন্তু স্বচ্ছ কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছিল ঝকমকে জলের ঢেউ।

নটিলাসের চারপাশে আধমাইল দূর পর্যন্ত জল বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল। জাহাজের কয়েক জন নাবিক ডুবুরীর পোশাক পরে খালি পিপে আর পেটি সরানোর কাজে ব্যস্ত। এই পিপে আর পেটি থেকে সোনার বাট ও মণিমুক্তা অন্তর্হিত হয়েছে। পিপেতে ভরে নাবিকরা সেগুলি নটিলাসে নিয়ে গেল এবং খালাস করে আবার আনতে গেল। মনে হল এই ধনরত্ন অফুরন্ত, কোনদিন তার শেষ হবে না।

এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলুম। এটাই হল ১৭০২ খৃস্টাব্দের সেই রণক্ষত্রে। ক্যাপ্টেন নিমো এই ধনরত্নের লোভেই এখানে এসেছিলেন। এই বিপুল বিত্তের তিনিই একমাত্র উত্তরাধিকারী। এখানে তার জিনিসে ভাগ বসাবার মত কেউ নেই।

—আপনি হয়ত ভাবছেন আমি একার ভোগের জন্যে এইসব সোনা-দানা সংগ্রহ করছি, ক্যাপ্টেন নিমো হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করলেন, আমি যে এগুলি কোন ভাল কাজে খরচ করি না তাই বা আপনাকে কে বলল? আপনি কি ভাবেন পৃথিবীতে যে অসংখ্য উৎপীড়িত অসহায় মানুষ আছে তা আমি জানি না?

এই পর্যন্ত বলে ক্যাপ্টেন নিমো চুপ করলেন। তাঁর এই আকস্মিক আবেগের প্রকাশ দেখে আমি একটা কথা বুঝতে পারছিলুম। সেটা

হল যে মানুষের সমাজের লক্ষ যোজন দূরে থেকেও তিনি এখনও একজন মানুষই রয়ে গেছেন। মানুষের কষ্টে তাঁর হৃদয় এখনও যন্ত্রণাবোধ করে এবং তাঁর অমিত বিত্ত নিপীড়িত মানব জাতির সেবাতেই ব্যয়িত হয়। আর তখনই বুঝতে পারলুম ক্রীট দ্বীপের কাছে যে বাক্সভর্তি সোনা তিনি পাঠিয়েছিলেন তা কাদের জন্যে।

চব্বিশ

পরের দিন খুব হতাশ ভঙ্গীতে নেড আমার ঘরে ঢুকল।

—এসো নেড, কাল অদৃষ্ট আমাদের প্রতি খুবই বিরূপ ছিল।

—হ্যাঁ, তা না হলে ঠিক যখন আমাদের জাহাজ ছাড়ার কথা তখন তিনি নটিলাসকে থামাবার আদেশ দেবেন কেন।

—হ্যাঁ নেড, তখন তাঁর ব্যাংকের সঙ্গে দরকার ছিল। বলে আমি গতরাতের সব ঘটনা নেডকে খুলে বললুম।

—যাই হোক, এখনও আশা আছে সে বলল, হারপুনের তাক একবার ফসকেছে, এবার আমাদের সফল হতেই হবে।

নেড কনসীলের কাছে ফিরে গেল। পোশাক বদলে আমি সেলুনে গিয়ে ঢুকলুম। কম্পাস মোটে সুখবর দিল না। আমরা ইউরোপকে পেছনে ফেলে এসেছি।

এক ঘণ্টা পর চার্ট দেখে আমি বুঝতে পারলুম যে নটিলাস তখন নিকটবর্তী তটভূমি দেখে ৩৩·২২ অক্ষরেখা দূরে রয়েছে। পালাবার এখন কোন উপায় নাই। নেডকে একথা জানাতে তার কি রকম রাগ হল তা অনুমান করা মোটেই কঠিন নয়।

ক্যাপ্টেন নিমো আমার ঘরে এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন যে তিনি আমাকে একটা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতে চান।

—আসুন, তাহলে ডুবুরীর পোশাক পরে নেওয়া যাক।

এ যাত্রায় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সহযাত্রী কেবল আমি। কয়েক

মিনিটের মধ্যে আমরা ডুবুরীর পোশাক পরে নিলুম। কিন্তু কোন আলো নেওয়া হল না। আমার হাতে একটা লোহার বর্শা দেওয়া হল। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা অতলান্তিকের নিচে এসে পৌঁছলুম। হঠাৎ ক্যাপ্টেন আমাকে একটা উজ্জ্বল লাল রঙের আলো দেখালেন। এ আলোটা যে কী এবং জলের মধ্যে কি ভাবে জ্বলছে আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

আধ ঘণ্টা হাঁটার পর আমরা পাথুরে রাস্তা পেলাম। এক একটা জায়গা এমন পিচ্ছিল যে হাতের বর্শা মাটিতে গেঁথে কোন রকমে টাল সামলাতে সামলাতে আমাকে চলতে হচ্ছিল।

সেই লাল আলো ক্রমশ উজ্জ্বলতর হচ্ছিল। একি কোন বৈদ্যুতিক আলোর বন্যা? এ আমি যা দেখছি পৃথিবীর মানুষ কি তার খবর রাখে না? আস্তে আস্তে আমাদের পথ আরো আলোকিত হয়ে উঠল। এই আলোর উৎস ছিল আটশো ফুট উঁচু একটা পাহাড়ের ওপর।

অতলান্তিকের নিচের এই প্রস্তর-রাজ্যে ক্যাপ্টেন নিমো এগিয়ে যাচ্ছিলেন সহজেই। দেখে মনে হল তিনি অনেকবার এই পথ দিয়ে যাতায়াত করেছেন। তাঁর নির্ভয় এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দেখে তাঁকে সমুদ্রের জিন বলে মনে হচ্ছিল।

পথটা আরও দুর্গম মরা গাছপালার ঝোপের জন্যে। মাঝে মাঝে বড় পাইন গাছও রয়েছে। সমস্ত পথটি সামুদ্রিক শৈবাল, কাঁকড়া ও চিংড়ি মাছে পরিপূর্ণ। আমাদের চলাফেরায় মাছেরা ভয় পেয়ে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে লাগল। এতখানি হাঁটবার পরও আমি ক্লান্ত বোধ করিনি। এমন সুন্দর দৃশ্য ভাষায় বর্ণনা করব এ শক্তি আমার নেই। দু পাশে মৃত অরণ্য আর পাথরের রাজ্য ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা। দেখে মনে হয় মানুষের সৃষ্টি। সেই মুহূর্তে যদি আমার সামনে কয়েকজন সমুদ্রতলের অধিবাসী আবির্ভূত হত তাহলে মোটেই অবাক হতাম না।

পাহাড়ের একটা ধাপের ওপর উঠে সামনে চেয়ে আমরা আরও

অবাক হয়ে গেলুম। চোখের সামনে এক বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ। প্রস্তর স্তূপগুলি দেখে সেকালে যে এককালে মন্দির ও দুর্গের অস্তিত্ব ছিল তা সহজেই বুঝতে পারা গেল। এখন সে সমস্ত ভাঙাচোরা স্তূপের ওপর সমুদ্র তার সুন্দর গালিচা পেতে দিয়েছে। কিন্তু প্লাবনে ভেসে যাওয়া এই অবলুপ্ত দেশের পরিচয় কি? এ আমি কোথায় এলুম? আমি কথা বলতে গেলুম কিন্তু তার আগেই ক্যাপ্টেন আমাকে নিরস্ত করলেন এবং এক টুকরো খড়ি পাথর কুড়িয়ে নিয়ে একটা কালো পাথরের গায়ে শুধু এই কথাটুকু লিখলেন, 'অ্যাটল্যান্টিস'।

আমার মনের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই সেই থিওপমপাস আর প্লেটো বর্ণিত এ্যাটলান্টিস যার কথা ইতিহাসে পড়েছি আজ তাকেই প্রত্যক্ষ করছি চোখের সামনে! আমার পায়ের নিচে এক বিস্মৃতপ্রায় যুগের অজানা শিল্পীর তৈরি প্রাসাদের ভস্মাবশেষ পড়ে রয়েছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর প্রথম মানুষটির সঙ্গী-সাথীরা।

প্রায় এক ঘণ্টা আমরা সেখানে রইলাম। আগ্নেয়গিরিটা থেকে থেকে লাভা উদ্গিরণ করছিল ও তার ফলে পাহাড়ের সংলগ্ন পাথরগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছিল। এই সময় জলের মধ্যে দিয়ে দেখলুম যে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের রশ্মি ম্লান হয়ে এসে এই মূক নগরীর ধ্বংসাবশেষের ওপর পড়ে এক রহস্যময় মায়াজাল সৃষ্টি করল।

ক্যাপ্টেন নিমো উঠে দাঁড়ালেন, শেষবারের মত এই ধ্বংসস্তূপের দিকে একবার তাকালেন, তারপর আমাকে তাঁর সঙ্গে আসতে বললেন।

পাহাড় থেকে আমরা বেশ তাড়াতাড়ি নামলুম। সেই প্রস্তরীভূত বৃক্ষরাজি পেরিয়ে এসে দেখলুম, দূর থেকে নটিলাসের বৈদ্যুতিক আলোটিকে একটি তারার মত দেখাচ্ছে। প্রথমে ক্যাপ্টেন নিমো ও তাঁর পেছনে পেছনে আমি যখন নটিলাসে প্রবেশ করলুম, সূর্যের আলো তখন সবে সমুদ্রের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে।

পঁচিশ

১৩ই ও ১৪ই মার্চ নটিলাস আবার তার দক্ষিণমুখো যাত্রা আরম্ভ করল। একি মেরুপ্রদেশের দিকে যাচ্ছে নাকি? সেটা কিন্তু নিছক পাগলামি হবে। তাই যদি হয় নেড তাহলে মিথ্যে ভয় পায় নি। কদিন আর নেড তার পরিকল্পনার কথা আমায় বলে নি। ইদানীং সে কথাবার্তা কমই বলছে। বুঝতে পারছি এই দীর্ঘ বন্দীদশা তার মনের ওপর একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে এবং কিছু করতে না পেরে সে ভেতরে ভেতরে রাগে ফুলছে। আমার ভয় হয় শেষ পর্যন্ত এই রাগের জন্যে একটা কেলেংকারী না বাধে। ২৮শে মার্চ সে আর কনসীল আমার ঘরে এসে ঢুকল।

—একটা প্রশ্ন করতে চাই প্রফেসর, নেড বিনা ভূমিকায় শুরু করল, 'নটিলাসে ক'জন লোক আছে বলে মনে করেন আপনি?'

—সে তো আমি সঠিক বলতে পারব না ভাই, আমি জবাব দিলুম, 'তবে আমার মনে হয় দশজন লোকই এই ডুবোজাহাজটা চালানোর পক্ষে যথেষ্ট। তবে আমার মনে হয় নটিলাস একটা সাধারণ জাহাজ মাত্র নয়, ক্যাপ্টেন নিমোর মত আরও যারা পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তাদের সবার আশ্রয়স্থল এই জাহাজ।'

'নেডের কি হয়েছে জানেন হুজুর,' কনসীল বলতে লাগল, 'দেশে যাবার জন্যে ও একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছে। সব সময় ওর অতীত জীবনের কথা মনে পড়ছে আর এই একঘেয়ে জল দেখে ওর বিরক্তি আরও বাড়ছে। আপনার মত অত পণ্ডিত ও নয় তাই সমুদ্রের সৌন্দর্য ওর মন ভোলাতে পারে না। ও চায় ওর ছোট্ট কুঁড়েটুকুতে ফিরে যেতে তার জন্যে ও সব কিছু করতে পারে।'

সত্যিই নেডের মত একজন লোকের পক্ষে এইরকম সমুদ্রযাত্রা খুবই বিরক্তিকর সন্দেহ নেই। এমনিতে সে প্রায় সবসময় মনমরা হয়ে

থাকত কিন্তু সেদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বেলা এগারোটার সময় সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভেসে যেতে যেতে নটিলাস এক ঝাঁক তিমির মধ্যে এসে পড়ল। আমরা প্ল্যাটফর্মের ওপর বসেছিলুম, হঠাৎ নেডের চোখে এই দৃশ্য পড়ল। দিকচক্রবালে সে একটি তিমি দেখতে গেল।

—দেখুন, দেখুন, ওর নাকের ফুটো দিয়ে কত জোরে জল বেরুচ্ছে দেখুন একবার, নেড বলে উঠল, 'এখন যদি আমরা তিমি ধরবার জাহাজে থাকতুম তাহলে আর আমার আনন্দের সীমা থাকতো না। দূর দূর, এই লোহার খাঁচায় থেকে আমি কি আর একটা মানুষ আছি নাকি।'

উত্তেজনার বশে মাটিতে পা ঠুকতে লাগল নেড, আর হারপুন বাগিয়ে ধরার জন্যে হাত নিশপিশ করতে লাগল তার।

—কিন্তু নেড, এই রকম ছটফট না করে ওদের শিকার করবার জন্যে ক্যাপ্টেনের অনুমতি চাইলেই তো পারো।

কনসীলের এই কথা শেষ হাওয়ার আগেই নেড হাওয়া। একটু পরেই ক্যাপ্টেন নিমোকে সঙ্গে নিয়ে সে এসে হাজির প্ল্যাটফর্মের ওপর।

তিমির ঝাঁক তখন নটিলাস থেকে এক মাইল দূরে। ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করলেন, তারপর বললেন, 'এগুলো হল দক্ষিণ দিকের তিমি।'

—ক্যাপ্টেন, আমি একজন অভিজ্ঞ হারপুন বীর, নেড বলল, 'আমাকে ওই তিমিগুলি শিকার করবার অনুমতি দেবেন কি?'

—কী জন্যে? ক্যাপ্টেন বললেন, 'নিছক ওদের মারবার নেশায়? আমার তো তিমির তেলের দরকার নেই।'

—কিন্তু স্যার? লোহিত সাগরে আপনি তো আমাকে ডিউগংটা মারবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

—সে আমার নাবিকদের মাংসের প্রয়োজন ছিল বলে, গম্ভীর স্বরে ক্যাপ্টেন জবাব দিলেন, 'অকারণ প্রাণীহত্যা আমি পছন্দ করি না। তাছাড়া এইভাবে প্রাণীহত্যা করে তেল ব্যবসায়ীরা এক চরম ক্ষতি

করছে বাকিন উপত্যকার সমস্ত তিমি তারা ধ্বংস করেছে। তাদের অত্যধিক লোভের জন্যে পৃথিবীর বুক থেকে একটি প্রয়োজনীয় প্রাণীর অবলুপ্তি ঘটতে চলেছে।'

ক্যাপ্টেন ঠিকই বলেছেন। এই ধরনের ব্যবসায়ীদের জন্যে একদিন হয়ত দেখা যাবে সমুদ্রে আর একটি তিমিও নেই। নেড কিন্তু এসব কথা বিশেষ গ্রাহ্য করছিল না, ক্যাপ্টেনের দিকে পেছন ফিরে পাতলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে শিস দিচ্ছিল সে।

এর কদিন পর থেকে আমি লক্ষ্য করলুম যে ক্যাপ্টেনের ওপর নেডের মেজাজ আরও খাপ্পা হয়ে উঠছে, আর সেইজন্যেই নেডের ওপর নজর রাখা আমার একটা কাজ হয়ে দাঁড়াল। ১৫ই মার্চ তারিখে কুড়ি থেকে পঁচিশ ফুট লম্বা বরফের চাঁই ভাসতে দেখলাম। নেডের ইতিপূর্বে উত্তর মেরুতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তাই সে এসব দেখে বিশেষ অবাক হল না। কিন্তু কনসীল আর আমার কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। বরফের মধ্যে আমরা যত এগুতে লাগলুম ততই কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আরও বড় বরফের চাঁই ঝকমক করে উঠতে লাগল। সূর্যের আলো এদের গায়ে পড়ে বহুবর্ণে রঞ্জিত হয়ে প্রতিফলিত হয়। আমরা যত দক্ষিণে এগুতে লাগলুম বরফ স্তূপের সংখ্যা ততই বাড়তে লাগল। ক্যাপ্টেন নিমোর সুদক্ষ পরিচালনায় নটিলাস সেই বরফ স্তূপের মাঝখানে সংকীর্ণ পথ করে এগুতে লাগল। চারিদিকে খালি হয় বরফের স্তূপ আর নয় মসৃণ বরফের সমতট। বরফ কখনও ভাঙছে, কখনও ভেসে যাচ্ছে। তাপমাত্রা এখানে খুবই কম, থার্মোমিটার দেখে বোঝা গেল শূন্যের দু তিন ডিগ্রী নিচে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কাছে সামুদ্রিক ভল্লুকের লোম দিয়ে তৈরি পোশাক ছিল। নটিলাসের ভেতরটা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দিয়ে গরম রাখা হচ্ছিল। এখন এই মেরু প্রদেশে একটানা ছমাস আর সূর্যালোক দেখা যাবে না।

১৬ই মার্চ সকাল আটটায় নটিলাস দক্ষিণ মেরুর মেরুবলয় অতিক্রম করল। এখন চারিদিকে বরফ। তুষারারণ্যের এই সৌন্দর্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। নানা আকৃতির বরফের

কোনটাকে মসজিদ কোনটাকে মিনার বলে মনে হচ্ছিল। কোথাও বরফের চাঙড় ভেঙে পড়ে তার শব্দ শোনা যায়। ১৬ই মার্চ কিন্তু আমাদের পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন নিমো কিন্তু তাতে দমলেন না। তিনি সজোরে বরফের ওপর আঘাত করে চললেন। এর ফলে বরফ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হল এবং শিলাবৃষ্টির মত ঝরতে লাগল আমাদের মাথায়। ১৮ই মার্চ নটিলাস কিন্তু সত্যি সত্যিই বরফের মধ্যে আটকা পড়ে গেল। এখন আর ছোটখাট বরফের চাঁই নয়। কয়েকটা পাহাড় বরফের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

ক্যাপ্টেন নিমো তখন প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন। আমি সেখানে হাজির হতে তিনি আমাকে বললেন, 'অবস্থা কি রকম বুঝছেন?'

—মনে তো হচ্ছে আমরা বরফের ফাঁদে আটকা পড়ে গিয়েছি। এখন সামনে শীত, বরফ আরও শক্ত হয়ে জমবে। এর মধ্যে দিয়ে বেরুনো খুবই কষ্টকর হবে।

—আপনাদের কষ্ট আর অসুবিধের কথা একবার শুরু হলে আর শেষ হতে চায় না। ক্যাপ্টেন একটু ব্যঙ্গভরে বললেন, 'আপনি দেখবেন মঁসিয়ে এ্যারোনাক্স, নটিলাস এই বরফের দুর্গ থেকে ঠিক পথ করে বেরুবে।'

—তাহলে চলুন, এগিয়ে চলুন তুষার স্তূপ চূর্ণ করে আসুন আমরা এগিয়ে যাই। তারপর গলায় একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে বললুম, 'আর যদি তাতেও কার্যসিদ্ধি না হয় তাহলে আসুন নটিলাসে পাখা লাগিয়ে উড়ে যাই এর ওপর দিয়ে।'

—না, না, ওপর দিয়ে নয়, ক্যাপ্টেন নিমো শান্তভাবে বললেন, 'নিচ দিয়ে।'

—নিচ দিয়ে, আমি অবাক হলুম।

—সাধারণ জলযানের পক্ষে যা একেবারেই অসম্ভব নটিলাসের পক্ষে তা নিতান্ত সহজ, ক্যাপ্টেন বলতে লাগলেন।

—ওহো, বুঝতে পেরেছি, আমি উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলুম, 'সমুদ্রের ওপর বরফ থাকলেও নিচে জলই থাকে। কিন্তু আমি যতদূর জানি বরফ ওপরে যতটা থাকে, নিচে থাকে তার তিনগুণ।

—হ্যাঁ, প্রায় তাই। ওপরে এক ফুট বরফ থাকলে নিচে থাকবে তিন ফুট। এই তুষার শৈলগুলি যদি জলের ওপর ৩০০ ফুটের বেশি উঁচু না হয় তা হলে নিচে তাদের গভীরতা নিশ্চয় ৯০০ ফুটের বেশী হবে না। আর ৯০০ ফুট ডুব দেওয়া নটিলাসের পক্ষে কিছু না।'

তারপর এই দুঃসাধ্য যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হল। বাতাস ধরে রাখার জন্যে নটিলাসের পাম্পগুলি খুব জোরে চালু করে দেওয়া। চারটের সময় ক্যাপ্টেন ওপরের ঢাকনি বন্ধ করে দিলেন। শেষবারের মত আমি সেই অতিকায় স্তূপটির দিকে তাকিয়ে নিলুম। ওরই নিচ দিয়ে যাব আমরা। ঠাণ্ডা এখানে খুব বেশী, শূন্যের বারো ডিগ্রী নিচে। কিছুক্ষণের মধ্যে বরফ পরিষ্কার হল, নটিলাসের ট্যাঙ্কে জল ভরে আমরা নিচে নামতে লাগলুম। কম্পাসের কাঁটা কাঁপতে লাগল। আমি কনসীলের পাশে বসে দক্ষিণ মেরুর তলদেশ দেখলুম। নটিলাস নিচে নামতে থাকল।

এবার নটিলাস সোজা দক্ষিণ মেরুর দিকে মুখ করে চলল। এখন তার গতি ঘণ্টায় ২৬ মাইল। এইভাবে চললে আমরা ৫৮ ঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে যাব।

কিন্তু না, হঠাৎ নটিলাস কেঁপে উঠতে বুঝলুম যে সে একটি তুষার শৈলের তলায় গিয়ে আঘাত করেছে। তার মানে এক হ'জার ফুট নিচে আমরা আটকা পড়েছি। অর্থাৎ এর ওপরে বরফ আছে তিন হাজার ফুট। সেদিন বেশ কয়েক বার নটিলাস ওপরে ওঠবার চেষ্টা করল, কিন্তু বরফের স্তরকে ভেদ করতে পারল না। সেদিন রাত পর্যন্ত আমাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না; তখনও আমাদের মাথার ওপর চার থেকে পাঁচশো গজ পুরু বরফ জমে রয়েছে। এখন আটটা বাজে। নটিলাসের রুটিন অনুযায়ী আরো চার ঘণ্টা তাজা বাতাস ভরে নেওয়ার কথা। সেদিন রাতে আমার ভাল ঘুম হল

না, ভয় ও আশঙ্কার মধ্যে মনটা দুলতে থাকল। কতবার বিছানা ছেড়ে উঠলুম। নটিলাস তখনও বরফ কেটে চলেছে। তিনটে নাগাদ আমি লক্ষ্য করলুম যে তুষার স্তূপের একটা অংশ মাত্র পঞ্চাশ ফুটের মত পাতলা হয়ে এসেছে। আমি একবারও ম্যানোমিটার থেকে আমার চোখ সরাই নি। ধীরে ধীরে আমরা জলের ওপর উঠছি। অবশেষে সেই স্মরণীয় ১৯শে মার্চের সকালবেলা ক্যাপ্টেন নিমো ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।

একটি মাত্র কথা তখন তিনি বললেন, 'সমুদ্রের দ্বার খুলেছে।'

—আমরা কি মেরু প্রদেশে পৌঁছে গেছি? আকুল আগ্রহের সঙ্গে আমি প্রশ্ন করলাম ক্যাপ্টেনকে।

—ঠিক বলতে পারছি না, ক্যাপ্টেন বললেন, 'দুপুরের দিকে বলতে পারব।'

সকাল দশটার সময় একটা দ্বীপ দেখা গেল। এক ঘণ্টা পরে আমরা সেখানে পৌঁছলুম। আর দু'ঘণ্টার মধ্যে আমরা সেটিকে একটি চক্কর দিয়ে নিলুম। একটি পাথরের ঢিপির কাছে নটিলাসকে দাঁড় করানো হল। একটি নৌকোয় চড়ে ক্যাপ্টেন, আমি, কনসীল ও কয়েকজন নাবিক সেই দ্বীপের কাছে এলুম। কনসীল নৌকো থেকে লাফ মেরে তীরে নামতে যাচ্ছিল, আমি তাকে পেছন থেকে ধরে ফেললুম।

—এই মাটিতে প্রথম পদক্ষেপ করবার অধিকার আপনার, ক্যাপ্টেন নিমোকে বললুম আমি, 'আর কেউ সে সম্মানের যোগ্য নয়।'

—ধন্যবাদ, বলে ক্যাপ্টেন তীরে নামলেন। তারপর পাথরের ওপর উঠে নীরবে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর অন্তরে যে আবেগ সমুদ্র উদ্বেলিত হয়ে উঠছিল তা তাঁকে দেখে আমি বুঝতে পারছিলুম।

তারপর প্রথমে আমি এবং আমার পরে কনসীল নামল সেই দ্বীপে। দ্বীপের মাটি দেখেই মনে হল এর সঙ্গে আগ্নেয়গিরি নিঃসৃত লাভা মেশানো রয়েছে। তবু চারদিকে কোথাও আগ্নেয়গিরি দৃষ্টি-

গোচর হল না। এখানে উদ্ভিদ খুব অল্প পরিমাণেই দেখতে পেলুম। তটের ওপর ঝিনুক, শামুক প্রভৃতি ছড়ানো রয়েছে।

আর দেখবার মধ্যে ছিল কিছু কিছু প্রবাল-স্তূপ। এ ছাড়া ছিল ছোট ছোট প্রজাপতি ও অসংখ্য তারা মাছ। হাজার হাজার পাখি পাখা ঝটপটিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। ঢিবির ওপর বসেছিল পেঙ্গুইন পাখি। বিরাট বিরাট ডানা মেলে ওপর দিয়ে উড়ে গেল এ্যালব্যাট্রস।

এগারোটা বেজে গেল তবু কুয়াশার ঘোমটা সরিয়ে সূর্যের মুখ দেখা গেল না। সূর্য না থাকলে আমরা যে মেরুতেই এসে পৌঁছেছি তা বোঝা দুষ্কর। ক্যাপ্টেন নিমো একটা পাথরের ওপর ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সমুদ্রকে বশ করেছেন কিন্তু সূর্যকে হাত করতে পারেন নি। বেলা গড়িয়ে দুপুর হল তবু যে কে সেই।

—আর কিছু করা যাবে না, দেখা যাক কাল কি হয়, বলে ক্যাপ্টেন আমাদের নিয়ে নটিলাসে ফিরে এলেন।

পরের দিন তুষারপাত বন্ধ হল। আস্তে আস্তে কুয়াশা পরিষ্কার হতে লাগল। ক্যাপ্টেন নিমো তখনও তাঁর ঘর থেকে বের হন নি। আমি আর কনসীল নৌকোয় চড়ে তীরে গিয়ে নামলুম। এই ওপরের দিকে জমিতেও আগ্নেয়গিরির লাভা, ব্যাসাল্ট প্রভৃতি মেশানো রয়েছে। এখানেও পাখি দেখতে পেলুম প্রচুর। বহু আকারের সীল দেখতে পেলুম। এদের মধ্যে কোনটা জলে, কোনটা আবার ডাঙায় বসে আছে।

—এই প্রাণীগুলি তো ভয়ঙ্কর তাই না হুজুর? প্রশ্ন করল কনসীল।

—না, তুমি যদি তাদের আক্রমণ না কর তাহলে তারা তোমায় কিছু বলবে না। কিন্তু কেউ যদি ওদের ওপর হামলা করতে যায় তাহলে ওরা ভীষণ ক্ষেপে যায়। সে সময় ওরা নৌকোগুলোকেও টুকরো টুকরো করে ফেলে।

—আরে এ যে ষাঁড়েদের ঐকতান শোনা যাচ্ছে, কনসীল হঠাৎ বলে উঠল।

—ষাঁড় নয়, আমি ওর ভুল সংশোধন করলুম, 'জলহস্তী।'

—ওরা কি লড়াই করছে?

—হয় লড়াই করছে নয় খেলছে।

আমরা এখন কালো পাথরগুলি বেয়ে উঠতে আরম্ভ করেছি। এই পাথরগুলির ওপরে বরফ পড়েছিল তাই এগুলি ভারী পিচ্ছিল হয়ে গিয়েছিল। সদাসতর্ক কনসীল কিন্তু একবারও পড়ল না। বরং আমাকে উঠতে সাহায্য করল।

শৈল শিখরটির ওপরের স্তরে উঠে আমরা দেখলুম যে ওপরের বরফে ঢাকা সমতলভূমিতে জলহস্তী গিজগিজ করছে। তারা নিজেদের মধ্যে মহানন্দে খেলা করছে এবং আমরা যে আওয়াজ শুনেছিলুম তা রাগের নয়, আনন্দের।

পরদিন ভোরবেলা ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে আমার দেখা হল প্ল্যাটফর্মের ওপর। আবহাওয়া একটু পরিষ্কার হচ্ছে তিনি জানালেন। আমার আশা হচ্ছে প্রাতরাশের পর ডাঙায় যেতে পাবর ও পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করব। এইরকম কথা হয়ে যাওয়ার পর আমি নেডকে খুঁজতে লাগলুম। লোকটার মেজাজ দিন দিন খারাপ হচ্ছে। হাজার বলা সত্ত্বেও নেড আমাদের সঙ্গে আসতে চাইল না।

প্রায় নটার সময় আমরা তীরে নামলুম। আকাশ আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছিল। একটা পাহাড়ের চুড়োকে পর্যবেক্ষণ স্থল হিসেবে বেছে নিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো সেই দিকে এগুলেন। পাহাড়ের মাঝে মাঝে ফাটল সেখান থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে আর গন্ধকের গন্ধ ভেসে আসছে নাকে। চুড়োর ওপর থেকে আমরা এক বিশাল সমুদ্র দেখতে পেলুম। উত্তরের সমুদ্র আর আকাশ এসে এক রেখায় মিলে গেছে। এতক্ষণে কুয়াশামুক্ত আকাশ তার নীল আঁচলখানি মেলে হাসছে। উত্তরের সূর্যকে দেখালো যেন এক জ্বলন্ত আগুনের পিণ্ড। আমি ক্রনোমিটার ধরেছিলুম আর রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলুম—ঠিক বারোটার সময় যদি সূর্যের অর্ধেকটা ডুবে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা দক্ষিণ মেরুতে এসে পৌঁছেছি।

ঠিক তাই হল। সূর্য তখন আধখানা ডুবেছে, ক্রনোমিটারের কাঁটা আমি দেখলুম বারোটার ঘরে।

—ঠিক বারোটা। চেঁচিয়ে উঠলুম আমি।

—তাহলে এই তো দক্ষিণ মেরু। ক্যাপ্টেন নিমো বললেন।

সূর্যের সেই অস্তমান রশ্মির দিকে আমি তাকালুম। আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে আস্তে আস্তে ক্যাপ্টেন নিমো বললেন, 'আমি ক্যাপ্টেন নিমো, আজ ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ২১শে মার্চ দক্ষিণ মেরুর নব্বুই ডিগ্রীতে এসে পৌঁছলুম। আজ থেকে আমি এই ভূভাগের স্বত্ব গ্রহণ করলুম।'

অস্তমিত সূর্যের রশ্মি তখন সমুদ্রকে রক্তিম করে তুলেছিল। সেইদিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন নিমো বলে উঠলেন, 'হে সূর্য বিদায়। এখন তোমার বিশ্রামের সময়। দিনের অবসান হল, এখন রাত্রি তার কালো পাখা নিয়ে নেমে আসুক, ছ'মাস অন্তহীন রাত্রির পালা শুরু হোক আমার এই নবলব্ধ রাজ্যের ওপর।'

ছাব্বিশ

পরের দিন ২২শে মার্চ ভোর ছ'টায় যাত্রার তোড়জোড় শুরু হল। তাপমাত্রা যন্ত্রে তাপ দেখলুম শূন্যের নিচে বারো ডিগ্রী, এর ওপর যখন হাওয়া উঠল তখন যেন শীত তার অদৃশ্য দাঁতে কামড়ে ধরল আমাদের।

নটিলাসের ট্যাঙ্কে জল ভরা হচ্ছিল, বুঝতে পারছিলুম যে নটিলাস এখন নিচে নামছে। প্রায় ২০০০ ফুট নেমে নটিলাস থামল, তারপর জলের মধ্যে ঢেউ তুলে সোজা উত্তরের দিকে চলল। রাত্রে নটিলাস এমন এক জায়গায় এল যার ওপরে একটা বিরাট ভাসমান তুষার-শৈল রয়েছে। রাত তিনটের সময় হঠাৎ একটা খুব ধাক্কার চোটে জেগে উঠলুম। বিছানার ওপর উঠে বসে বুঝতে চেষ্টা করছি কি হয়েছে,

এমন সময় আর এক ধাক্কায় ছিটকে পড়লুম ঘরের মাঝখানে। হাতড়ে হাতড়ে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির পাশ দিয়ে ঢুকলুম। সেলুনের আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় দেখলুম যে ঘরের আসবাবপত্র এদিকে ওদিকে ছত্রখান হয়ে পড়ে আছে। ঠিক সেই সময় আমি বাইরে পায়ের শব্দ ও কাদের কথা শুনতে পেলুম। আমি ছুটে ঘর থেকে বেরোবার মুখে এসে গেল কনসীল আর নেড।

—কি ব্যাপার কি ? আমি ওদের দেখেই জিগ্যেস করলুম।

—আমি তো হুজুর আপনাকেই শুধোতে এসেছি। জবাব দিল কনসীল।

—বাজে কথা ছাড়ো। নেড চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি জানি কি হয়েছে। নটিলাস বেকায়দায় আটকে গেছে আর যে ভাবে সে কাত হয়ে পড়ে আছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এখান থেকে বেরুনো তার পক্ষে বড় সহজ হবে না। টোরস প্রণালী থেকে যে বেরুনো গিয়েছিল সে অন্য ব্যাপার ছিল।'

—এস তোমরা আমার সঙ্গে, আমি ওদের দুজনকে ডাকলুম, 'ক্যাপ্টেনেরর শরণাপন্ন হওয়া যাক।'

কিন্তু ক্যাপ্টেন নিমোকে কোথাও পাওয়া গেল না। লাইব্রেরীতে, চালকদের ঘরে গিয়ে, আমরা তাঁর দেখা পেলুম না। অগত্যা তাঁর সেলুনে অপেক্ষা করাই উচিত মনে করলুম। মিনিট কুড়ি পরে ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে প্রবেশ করলেন। তাঁর স্বাভাবিক শান্ত মুখে এখন অস্থিরতার চিহ্ন ফুটে উঠেছে। কোন কথা না বলে তিনি মানচিত্রটির ওপর ঝুঁকে কি দেখতে চাইলেন। এসময় আমি তাঁকে বিরক্ত করলুম না। কাজ শেষ করে কয়েক মিনিট পরে যখন তিনি আমার দিকে তাকালেন তখন তিনি টোরস প্রণালীতে আমাকে যা বলেছিলেন আমি তাঁকে তাই বললুম, 'একটা ঘটনা ঘটেছে তাই না ক্যাপ্টেন ?'

—না না, এবার আর ঘটনা নয়, একটি দুর্ঘটনাই ঘটেছে।

—একটা জিনিস বুঝতে পারছি যে নটিলাস আটকে পড়েছে —তাই না ?

—হ্যাঁ, তা ঠিক।

—কেমন করে ঘটল এটা ?

—আমাদের কোন দোষ নয়, প্রকৃতির খেয়ালের জন্যেই মানুষের তৈরি নিয়মকে তুচ্ছ করতে পারি, কিন্তু প্রকৃতির নিয়মের সঙ্গে লড়ার সাধ্য আমাদের কোথায় ?

—একটা বিরাট বরফের চাঁই, পুরো একটা পাহাড় হঠাৎ উল্টে পড়েছে, তিনি উত্তর দিলেন। 'তুষার জলের নিচে যদি এরপর কোন কিছুর ধাক্কা লাগে বা সেখানে যদি অপেক্ষাকৃত গরম জল থাকে তাহলে তা ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে পড়ে যায়। ঠিক এই জিনিসটিই ঘটেছে।'

—কিন্তু নটিলাসে আটকানো সমস্ত জল ছেড়ে দিয়েও কি আমরা এর ভারসাম্য ঠিক করে নিতে পারি না ?

—এখন সেই চেষ্টাই হচ্ছে। ক্যাপ্টেন উত্তর দিলেন, 'জল পাম্প করার শব্দ আপনি নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছেন। ম্যানোমিটারের কাঁটার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আস্তে আস্তে নটিলাস ওপরে উঠছে। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে, বরফের চাঙড়টাও উঠছে এর সঙ্গে সঙ্গে।

বরফটা পড়বার পর থেকে নটিলাস প্রায় দেড়শো ফুট ওপরে উঠেছে। হঠাৎ জাহাজের ভেতর একটা কম্পন অনুভব করা গেল। বোঝা গেল যে সে আস্তে আস্তে সোজা হচ্ছে। কেউ কোন কথা বলল না। রুদ্ধশ্বাসে সবাই আমরা দাঁড়িয়ে রইলুম কি হয় তা দেখার জন্যে।

—যাক, এতক্ষণে নটিলাস আবার সোজা হল, আমি হাঁফ ছেড়ে বলে উঠলুম।

—হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। সেলুনের দরজার কাছে যেতে যেতে ক্যাপ্টেন নিমো বলে উঠলেন।

এতক্ষণে আমরা খোলা সমুদ্রে এলুম। কিন্তু নটিলাসের দশ গজ দূরে দু পাশে বরফের দুর্ভেদ্য প্রাচীর রয়েছে দেখতে পাওয়া গেল। ওপরেও বরফ ; সেই একই তুষার স্তূপের অংশ বেঁকে ওপরে ছাদের মত হয়ে গেছে। নটিলাসের লণ্ঠনের আলো এই তুষার স্তূপের গায়ে লেগে এক বিচিত্র উজ্জ্বল সৌন্দর্যের সৃষ্টি করল।

—কী সুন্দর! উচ্ছ্বাসভরে বলে উঠল কনসীল।

—হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দর। আমি বললুম, 'কি বল নেড?'

—সুন্দর তো বটেই, নেড ঝংকার দিয়ে উঠল! এ তো স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু কথা হচ্ছে এই সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত আমাদের সইলে হয়।

সকাল পাঁচটায় হঠাৎ নটিলাসের অগ্রভাগে কিসের ধাক্কা লাগল। আমি বুঝলুম যে এর ছুঁচলো অগ্রভাগটা নিশ্চয় কোন বরফের পিণ্ডকে আঘাত করেছে। আমি ভাবলুম যে ক্যাপ্টেন নিমো তাঁর গতিপথ পাল্টে হয়ত এই বাধা বিপত্তিগুলো ঘুরে যাবেন, আর নয়তো সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে পথ করে এগুবেন। আমাদের সামনের পথ নিশ্চয় একেবারে বন্ধ নয়। কিন্তু আমি যেরকম আশা করেছিলুম সে রকম কিছুই ঘটল না। হঠাৎ গতি পরিবর্তন করে নটিলাস উল্টোদিকে চলতে শুরু করল।

—আমরা পেছন দিকে যাচ্ছি যে, কনসীল হঠাৎ বলে উঠল।

—হ্যাঁ, এই সুড়ঙ্গের সামনের দিকে বেরুবার কোন পথ নেই।

—তাহলে কী হবে?

—কি আর হবে। আমরা দক্ষিণ সমুদ্রের খোলা অংশে গিয়ে পড়ব।

ম্যানোমিটার দেখে বুঝলুম নটিলাস তিনশো গজেরও বেশী গভীরতায় রয়েছে। কাঁটা তখনও দক্ষিণমুখে, গতি প্রতি ঘণ্টায় কুড়ি মাইল। অর্থাৎ এইরকম সংকীর্ণ পথ দিয়ে নটিলাস তখন বেশ জোরেই চলেছে। আটটা বাজতে ঠিক পঁচিশ মিনিটের মাথায় নটিলাস দ্বিতীয় বার ধাক্কা খেল। এইবার ধাক্কাটা এল পেছন দিক থেকে। আবার মুখ শুকিয়ে গেল। ঠিক সেই সময় ক্যাপ্টেন সেখানে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর দিকে ছুটে গেলুম।

—আমাদের দক্ষিণ দিকের পথটা কি বন্ধ হয়ে গেল?

—হ্যাঁ। তুষার শৈলটা তার জায়গা বদলে আমাদের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

—আমরা তাহলে বেশ মোক্ষমভাবে আটকা পড়েছি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

নটিলাসের ওপরে নিচে এখন বরফের দুর্ভেদ্য দেয়াল। তুষার কারাগারে বন্দী এখন আমরা। আমি ক্যাপ্টেনকে লক্ষ্য করছিলুম। তাঁর মুখে কিন্তু সেই নিরুদ্বেগ প্রশান্তি।

—ভদ্রমহোদয়গণ, শান্তভাবে আমাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলতে থাকেন, 'এই অবস্থায় দুভাবে আমরা মরতে পারি। এক হচ্ছে বরফের চাপে গুঁড়িয়ে যাওয়া আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাতাসের চাপে দমবন্ধ হয়ে মরা। খাদ্যাভাবে মরবার আশঙ্কা আমাদের নেই।'

—ক্যাপ্টেন, আপনি কি মনে করেন আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমরা মুক্তি পাব না?

—আমরা চেষ্টা করব। প্রয়োজন হলে এই তুষার প্রাচীরকে আমাদের বিদীর্ণ করতে হবে।

—কোন দিকে আমরা আঘাত করব?

—আমি নটিলাসকে নিচের দিক দিয়ে চালাচ্ছি। বরফ যেখানে সবচেয়ে কম পুরু সেইখানে তাকে কাটতে চেষ্টা করব।

এই পর্যন্ত বলে ক্যাপ্টেন নিমো চলে গেলেন। এর পরই এক ধরনের হিস-হিস শব্দ শুনে বুঝলুম যে নটিলাসের ট্যাংকের ভেতর জল ঢোকানো হচ্ছে।

আস্তে আস্তে নটিলাস জলে ডুবল আর সাড়ে তিনশো গজ নিচে সেই বরফটার ওপর থামল গিয়ে।

—পরিস্থিতি খুবই সংঘাতিক, কনসীল আর নেডকে উদ্দেশ করে বললুম আমি, 'আমি তোমাদের সাহস আর শক্তির ওপর ভরসা রাখি।'

—মঁসিয়ে এ্যারোনাক্স, আমাকে দিয়ে যদি কারুর এতটুকু ভাল হয়, তার জন্যে আমি প্রস্তুত, বলল নেড।

—সাবাস নেড, এই তো চাই। আমি হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলুম নেডের সঙ্গে।

—ওরা কুড়ুল দিয়ে বরফ কাটতে চাইছে, আমার মনে হয় আমার

হারপুন দিয়ে আমি ওদের যৎসামান্য সাহায্য করতে পারি। আপনি দয়া করে এই বিষয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলুন।

—চল নেড, ক্যাপ্টেনর কাছে যাই। তিনি বোধহয় আমাদের কথা রাখবেন।

ক্যাপ্টেনকে নেডের কথা বলতে তিনি সানন্দে রাজী হলেন। নেড তার সামুদ্রিক পোশাক পরে হারপুন নিয়ে তৈরি হল। অল্পক্ষণ পরেই দেখলুম বারোজন নাবিক বরফের ওপর দিয়ে নামছে। ওদের সবার মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল নেড। ক্যাপ্টেন নিমোও দলে ছিলেন। দেয়াল খোঁড়ার কাজ আরম্ভ করার আগে তিনি একটু মাপজোক করে নিলেন। মাথার ওপর বরফের কাছে আঘাত করা খুবই কঠিন কাজ। তাই আর সে পথে না গিয়ে পাশের দিকের দেয়ালে কুড়ুলের ঘা মারার ব্যবস্থা হল। কঠিন বরফের চাঁইয়ের ওপর মুহুর্মুহুঃ কুড়ুলের ঘা পড়তে লাগল। দু ঘণ্টা পরিশ্রমের পর নেড ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে আর তার সহকর্মীরা বিশ্রাম করতে লাগল। নতুন এক দল গিয়ে যোগ দিল কাজে। সেই দলে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলুম আমি আর কনসীল।

সেদিন অনেকক্ষণ বরফ কাটার কাজে মেতে রইলুম। কাজ করতে বেশ ভালই লাগছিল। তাছাড়া নটিলাসের ভেতর শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে তখন বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ইতিমধ্যে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ আরো বেড়ে গেছে। জলে প্রচুর অক্সিজেন রয়েছে এবং একে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারলে ফের শ্বাস প্রশ্বাসের উপযোগী করে তোলা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে, যখন কার্বন ডাই-অক্সাইডে জাহাজের সর্বত্রই বায়ু দূষিত হয়ে গেছে তখন আর এইভাবে অক্সিজেন উৎপাদন করে লাভ কি? সেদিন সন্ধ্যাবেলা ক্যাপ্টেন নিমো সংরক্ষিত ভাণ্ডার থেকে কিছু বাতাস ছাড়বার হুকুম দিলেন। এই হুকুম দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। পরের দিন আবার বরফ খোঁড়ার কাজে লাগলুম আমরা সকলে। তুষারশৈলটার নিচের স্তর ও চার-পাশের দেয়াল আস্তে আস্তে জমাট বাঁধতে লাগল। স্পষ্টই বোঝা

গেল নটিলাস সেখান থেকে বেরুতে পারার আগেই দুপাশ থেকে বেড়ে এসে তারা এক হয়ে যাবে। এই কথা ভাবতেই এক হতাশা এসে আমায় গ্রাস করল। আমি ভাবলুম আর কতক্ষণই বা এভাবে লড়তে পারব। ওঃ কি শাস্তি! এর চেয়ে পাপুই দ্বীপের অসভ্যদের হাতেও আমাদের এত নির্মম মৃত্যু ঘটত না।

—মঁসিয় এ্যারোনাক্স, ক্যাপ্টেন নিমো আমার কাছে এসে বললেন, 'আমরা যদি একেবারে মরীয়া হয়ে বাঁচতে চেষ্টা না করি তাহলে এই বরফের মধ্যে আমাদের একেবারে জমে যেতে হবে।'

—তা বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করতে চান আপনি?

—বরফ জমাট হয়ে যাওয়াটা আমাদের আটকাতে হবে যে করে হোক। এতে যে দু পাশের দেয়ালই এগিয়ে আসবে তা নয়, নটিলাসের সামনে আর পেছনে যে দশ ফুটেরও কম জল রয়েছে তা-ও জমে গেলে আমাদের দশা চরমে উঠবে।

—আমাদের কাছে যে বাতাস সংরক্ষিত আছে তার ফলে আমরা আর কতক্ষণ নটিলাসে নিশ্বাস নিতে পারব?

ক্যাপ্টেন আমার মুখের দিকে তাকালেন তারপর বললেন, 'কাল পর্যন্ত, তারপরই তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আমার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে লাগল। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম আমি অত্যন্ত দুর্বল বোধ করছি। হঠাৎ ক্যাপ্টেন নিজের মনে বলে উঠলেন, 'ফুটন্ত গরম জল।'

—গরম জল! আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলুম।

—হ্যাঁ। এখানে প্রচুর পরিমাণে গরম জল ঢালতে পারলে জল ঘন হওয়াটা বন্ধ হবে।

—চেষ্টা করে দেখা যাক। আমি বললুম।

নটিলাসের বাইরের তাপমাত্রা তখন শূন্যের সাত ডিগ্রী নিচে। ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে নিয়ে এলেন পানীয় জল গরম করার বিরাট বিরাট যন্ত্রগুলি যেখানে রাখা ছিল সেইখানে। বিদ্যুৎ শক্তির সাহায্যে এই জল গরম করা হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে জলের তাপ উঠল

একশো ডিগ্রী। তখন সেই জলকে পাম্পের ভেতর দিয়ে চালিয়ে আবার নতুন জল ভরা হতে লাগল। তিন ঘণ্টা এইভাবে কাজ করার ফলে বাইরের তাপ শূন্যের সাত ডিগ্রীর জায়গায় ছ'ডিগ্রীতে নেমে এল। দু ঘণ্টা পরে শীতলতা কমে গিয়ে উত্তাপ দাঁড়াল শূন্যের নিচে চার ডিগ্রী।

—এইভাবে আমরা নিশ্চয় সফল হবো। আমি বললুম।

—আমারও তাই মনে হয়। ক্যাপ্টেন বললেন।

তারপরের দিন তাপ বেড়ে উঠল শূন্যের এক ডিগ্রী নিচে। তার পরের দিন আরও ছ'গজ পরিমাণ বরফ কাটা হয়ে গেল। নটিলাসের ভেতরের আবহাওয়া সেই রকমই আছে, আজ তা আরও খারাপ হবে। শ্বাস-প্রশ্বাসের বেশ কষ্ট হতে লাগল। বেলা তিনটে নাগাদ অবস্থা আরও খারাপ হল। এই দূষিত বাতাস গ্রহণের ফলে আমার ফুসফুসে বেশ কষ্ট হচ্ছে। আস্তে আস্তে আমার চেতনা লোপ পাচ্ছে। আমার সব বিপদের সঙ্গী কনসীল একেবারে হাল ছেড়ে দেয় নি, সে ঠিক পাশে বসেছিল। আমার হাতটা ধরে সে বিড়বিড় করে বলল, 'আমি যদি নিশ্বাস না নিয়ে থাকতে পারতুম তবে সে বাতাসটা আমার প্রভুর কাজে লাগত।'

তার এই কথা শুনে আমার চোখে জল এল। ওই বরফের বাধাকে সরিয়ে ওপরের মুক্ত হাওয়ার সংস্পর্শে না এলে মুক্তি নেই। আমাদের হাত ব্যথা করছিল। জায়গায় জায়গায় হাতের চামড়া ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। তবু আমরা থামলুম না।

আমরা সবাই পালা করে এই কাজ করছিলুম। ক্যাপ্টেনও আমাদের দলে ছিলেন। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে তিনি তাঁর কুড়ুল ও নিশ্বাসের যন্ত্রটি আর একজনকে দিয়ে নটিলাসের সেই দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে ফিরে গেলেন।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন পূর্ণোদ্যমে কাজ চলছিল। আর মাত্র দু'গজ পরিমাণ বরফ কাটা বাকি। এদিকে আমাদের হাওয়াও ফুরিয়ে এসেছে। যা সামান্য আছে তা ওই কঠিন পরিশ্রমে বড়

নাবিকদের জন্যে রাখা দরকার। সেদিন কাজের শেষে আমি যখন নটিলাসে ফিরে গেলুম, তখন মনে হচ্ছিল আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।

সেদিন ছিল আমাদের বন্দীদশার ষষ্ঠ দিন। কুড়ুল দিয়ে বরফ কাটার কাজ বেশী এগোচ্ছে না দেখে ক্যাপ্টেন নিমো ঠিক করলেন যে নিচের দিকের বরফ স্তূপকে চূর্ণ করে তিনি এগিয়ে যাবেন। অদ্ভুত এই লোকটার ধৈর্য। হাজার বিপদের মধ্যেও তিনি বুদ্ধি হারান না এবং নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করতে তাঁর বিন্দু মাত্র ক্লান্তি দেখা দেয় না।

তাঁর আদেশে নটিলাসকে হাল্কা করে ফেলা হল। তারপর সেটিকে জলে ভাসিয়ে নিয়ে আসা হল পরিখাটার ওপর। এরপর নটিলাসের জলের ট্যাংকের কল খুলে সেগুলিকে জলে ভর্তি করে দেওয়া হল। জাহাজের সর্বত্র একটা চাপা উত্তেজনা। এই শেষ চেষ্টার ওপর আমাদের জীবন-মরণ নির্ভর করছে। হঠাৎ একটা শব্দ করে ছেঁড়া কাগজের মত বরফের স্তর ফেটে গেল। নটিলাস ডুব দিল নিচে।

—আমরা নিচে নামতে পেরেছি! আমার কানে কানে বলে উঠল কনসীল।

আমি তার কথার কোন উত্তর দিতে পারলুম না। তার হাতটাকে ধরে অত্যন্ত দুর্বলভাবে আমি তাতে একটু চাপ দিলুম। এদিকে নটিলাস সজোরে বুলেটের মত জলে ঝাঁপ দিল। কয়েক মিনিট পরে নটিলাসের নিচে নামাটা বন্ধ হয়ে গেল। ম্যানোমিটার দেখে বোঝা গেল নটিলাস এখন ওপর দিকে উঠছে। পূর্ণ গতিতে ইঞ্জিন চালানো হল। প্রবল গতির ফলে নটিলাসের লোহার শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকল। কয়েক মিনিট পরে নটিলাসের নিচে নামাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমরা উত্তরের দিকে ধেয়ে গেলুম। কিন্তু সমুদ্রের তলায় পৌঁছতে নটিলাসের যদি আর একদিনও সময় লাগে তাহলে আমি আর জীবিত থাকব না।

লাইব্রেরি ঘরে একটি ডিভানের ওপর আধশোয়া অবস্থায় আমি

মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছিলুম। সময় সম্বন্ধেও আমার কোন ধারণা ছিল না। এই ভাবে যে কতক্ষণ কাটল তা আমি জানি না, তবে এটুকু বুঝতে পারছিলুম যে মৃত্যু আমায় ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ আমার ফুসফুসে যেন খানিকটা বাতাস এল। তবে কি আমরা জলের ওপরে উঠছি? না, তা নয়। এ হল আমার দুই পরম বন্ধু—নেড আর কনসীলের আত্মত্যাগের ফল। একটি যন্ত্রের মধ্যে তখনও কিছুটা বাতাস ছিল সেটি তারা নিজেরা ব্যবহার না করে আমার নিশ্বাসের কাজে লাগিয়েছে। নিজেরা অসহ্য কষ্ট পেয়ে তারা তাদের প্রাণবায়ু বিন্দু বিন্দু করে আমায় দিয়েছে। অসম্ভব জোরে, ঘণ্টায় প্রায় চল্লিশ মাইল বেগে সমুদ্রকে ছিন্নভিন্ন করে নটিলাস ছুটছিল। বরফের স্তরকে চরম আঘাত হানবার জন্যে নটিলাস তির্যক ভাবে তার সামনের দিকটা উঁচু করে প্রবল জোরে আঘাত করল। একবার মেরে পিছিয়ে এসে আবার আঘাত করতে হল এবং অবশেষে ছিন্ন হল সেই বরফের স্তর। নটিলাস ওপরে ঢুকল—সমুদ্রের খোলা বাতাস ভেতরে ঢুকে নটিলাসকে নতুন জীবন দান করল।

—আঃ কনসীল বলে উঠল, অক্সিজেনর কী আশ্চর্য ক্ষমতা। আবার আমরা আমাদের হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছি। হুজুর আপনি এখন নির্ভয়ে বাতাস নিতে পারেন।

নেড কোন কথা বলল না কিন্তু সে এমন প্রকাণ্ড হাঁ করে শুয়ে পড়ল যে দেখলে হাঙরেও ভয় পেত।

প্রথম কথা বলতে পেরে আমি নেড আর কনসীলকে ধন্যবাদ জানালুম।

—এখন দেখা যাক ভদ্রলোক জাহাজটা কোথায় নিয়ে যান—প্রশান্ত মহাসাগর দিয়ে না অতলান্তিক দিয়ে।

আমি নেডের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলুম না। আমার ভয় হল যে, যে বিশাল সাগর এশিয়া এবং আমেরিকা ছুঁয়ে আছে ক্যাপ্টেন নিমো হয়ত সেইদিকেই আমাদের নিয়ে যাবেন। এইভাবে তিনি তাঁর বিশ্বব্যাপী সমুদ্র পরিক্রমা শেষ করে এমন এক জায়গায়

যাবেন যেখানে নটিলাস পরম নিশ্চিন্তে ভেসে বেড়াতে পারে। মেরুবলয় ছাড়িয়ে এখন নটিলাস চলেছে হর্ণ অন্তরীপের দিকে। ক্যাপ্টেন নিমোকে এখন ভেতরে বা প্ল্যাটফর্মের বাইরে কোথাও দেখতে পাচ্ছিলুম না। সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট প্রতিদিন দিক-নির্ণয় যন্ত্রটিতে জাহাজের গতিপথের নির্দেশ রেখে যেতেন, আমিও তাই দেখে নটিলাস কোন দিকে যাচ্ছে তা বুঝতে পারতুম। যেদিন সন্ধ্যাবেলা আমি বুঝতে পারলুম যে নটিলাস উত্তর দিক দিয়ে অতলান্তিকে যাচ্ছে সেদিন আমার বেশ আনন্দ হল।

আমরা নিরক্ষরেখা পেরোলাম। কুড়ি মাইল পশ্চিমে গায়না নামে একটি ফরাসী অঞ্চল ছিল এবং বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশে আমরা এইখানে উঠতে পারতুম কিন্তু এমন প্রবল বেগে বাতাস বইছিল যে নৌকো নিয়ে এগুনো বিপজ্জনক ছিল। নেড সেটা বুঝতে পারল এবং তাই সে কোন উচ্চবাচ্য করল না। তার পালানো সম্পর্কে আমি নিজে থেকে কথা বলিনি কেন না এ পরিকল্পনা সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল।

১৬ তারিখে আমরা মার্টিনিক বা গুয়াডালুপের উচ্চশৃঙ্গগুলি দেখতে পেলুম প্রায় ত্রিশ মাইল দূর থেকে। নেডের মতলব ছিল মেক্সিকো উপসাগরের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় সেখান দিয়ে যে অগুন্তি নৌকো আসা-যাওয়া করে তার একটাতে চড়ে চম্পট দেওয়া। কিন্তু নটিলাস সেখানে আদৌ না যাওয়ায় তাকে এই পরিকল্পনা বাতিল করতে হল। ফলে বেচারী নিদারুণ মুষড়ে পড়ল। সমুদ্র যেখানে সঙ্কীর্ণ সেখানে হঠাৎ একটা নৌকা পাওয়া গেলে হয়ত পালানোর কথা ভাবা যেত, কিন্তু এই রকম উন্মুক্ত সমুদ্রে সে রকম কথা চিন্তাও করা যায় না। আমরা তিনজনে বসে এইসব আলোচনা করছিলুম। নটিলাসে আমাদের প্রায় ছ'মাস কেটে গেছে। আমরা প্রায় ১৭,০০০ মাইল পথ ঘুরেছি এবং নেডের মতে এইবার এই যাত্রার শেষ হওয়া উচিত। ক্যাপ্টেন যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের মুক্তি দেবেন এরকম মনে হয় না; কিছু করতে গেলে নিজেদেরই তা করতে হয়। তাছাড়া কিছুদিন হল

তিনি আরও বেশী গম্ভীর এবং নির্জনতা বিলাসী হয়ে পড়েছেন। এমন কি আমার সঙ্গও তিনি পরিহার করে চলেছেন। আগে এই অতলান্ত সমুদ্রের বিচিত্র রহস্যের কথা তিনি আমায় শোনাতেন, কিন্তু এখন আর তিনি নিজে থেকে কিছু বলেন না।

অ্যান্টিলাস্ উপসাগরে আমি আবার অনেক জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে পেলুম। উদ্ভিদের মধ্যে ফিসালিস পেলাজিকা উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গোবি ও ম্যাকারেল মাছ দেখতে পেলুম প্রচুর। ২০শে এপ্রিল তারিখে আমাদের সবচেয়ে কাছে যে স্থলভূমি ছিল তা হল বাহামা দ্বীপপুঞ্জ। জলের নিচে উঁচু উঁচু খাড়ির ওপর বিচিত্র সামুদ্রিক উদ্ভিদ তাদের গালচে পেতে দিয়েছিল। হঠাৎ কনসীল সেই ঘড়ির মধ্যে একটা বড় ফুটোর প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

—আমার মনে হয় ওটি বোধ হয় পোল্প গুহা হবে। আমি বললুম।

—ওরকম কোন প্রাণী আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। নেড বলল গম্ভীর ভাবে।

—আমি কিন্তু নিজের চোখে একটা পোল্পকে তার দাঁড়া দিয়ে জলের তলায় জাহাজ টেনে নিয়ে যেতে দেখেছি, কনসীল বলল খুব গম্ভীরভাবে।

—তোমার নিজের চোখে ? তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল নেড কনসীলের মুখের দিকে।

—নিজের চোখে। সেন্ট মালোতে—

—এই বন্দরটা কোথায় ভাই ?

—বন্দর নয় ওটা একটা গির্জা।

—গির্জা ! নেড প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে।

—হ্যাঁ ভাই, গির্জায় টাঙানো একটি ছবিতে আমি এই দৃশ্য দেখেছি।

এই কথা শুনে হোহো করে নেডের সে কি হাসি !

—আমিও এই ছবিটির কথা শুনেছি। আমি বললুম, 'ওটি একটি

কিংবদন্তীর চিত্রায়ণ। তোমরা জানো কিংবদন্তী বা উপকথায় আসল বিষয়কে একটু বাড়িয়েই বর্ণনা করা হয়। এই পোল্প যে কেবল জাহাজ টেনে নিয়ে যায় তাই নয়, এমন কথাও শোনা গেছে যে এক-একটি পোল্প নাকি ছোটখাট দ্বীপের সমান হয়। পন্টোপিডান নামে এক বিশপের বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে একবার একটা পুরো সৈন্যবাহিনী নাকি ভুল করে একটা পোল্পের পিঠের ওপর নামে। এইসব গল্পের অনেকখানি অতিরঞ্জিত তবে ত্রিয়েস্তে ও মন্টোপেলিয়রের জাদুঘরে যে পোল্পদের কঙ্কাল রাখা আছে তাদের দৈঘ্য দু'গজ। আর দাঁড়াগুলি সাতাশ ফুট লম্বা। তাহলেই বুঝতে পারছ এরা কি ধরনের সাঙ্ঘাতিক প্রাণী।

—কাট্‌ল মাছও শুনেছি খুব লম্বা হয়, নেড বলল।

—হ্যাঁ, এরা এক জাতের অক্টোপাস।

জানলার কাছে বসে কনসীল উঁচু-নিচু পাহাড়ের চূড়া দেখছিল। আমার কথার মাঝখানে সে বলে উঠল, 'ওটা লম্বায় ছ'গজের মত ছিল কি হুঁজুর ?'

—ঠিক তাই। আমি জবাব দিলুম।

—আর ওর মাথায় বোধ হয় আটটা দাঁড়া ছিল, তাই না ?

—হ্যাঁ। হ্যাঁ।

—ওর চোখ দুটো তো ছিল মাথার পেছনে তাই না ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই।

দূরে আঙুল দেখিয়ে শান্ত গলায় কনসীল বললে, 'তাহলে এখন আমি যা দেখছি ওটা একটা কাট্‌ল মাছ না হয়েই যায় না।'

নেড ছুটে গেল জানলাটার কাছে। পরক্ষণেই সে আর্তনাদ করে উঠল, 'কী সাঙ্ঘাতিক প্রাণী।'

আমিও ছুটে জানলার কাছে গিয়ে যা দেখলুম তাতে আমার মনে হল কিংবদন্তীর সব কাহিনীই মিথ্যে নয়। প্রায় আট গজ লম্বা একটা বিরাট কাট্‌ল মাছ নটিলাসের দিকে তীরবেগে ছুটে আসছে। মাছটা ওজনে প্রায় চার পাঁচ হাজার পাউণ্ড হবে।

দেখতে দেখতে সেখানে আরো সাত-আটটা কাট্‌ল মাছের আবির্ভাব হল। তারা নটিলাসের পেছন পেছন মিছিল করে আসতে লাগল। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি খেয়ে নটিলাস দাঁড়িয়ে গেল।

মিনিট খানেক পরে ক্যাপ্টেন নিমো তাঁর সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে সেলুনে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখখানা বেশ গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

—কাট্‌ল মাছের ছড়াছড়ি, আমি বললুম।

—হ্যাঁ, এবং ওদের সঙ্গে আমাদের লড়াই করতে হবে। আমার মনে হয় ওদের কারো চোয়াল নটিলাসের ব্লেডে আটকে গিয়ে তার গতি রুদ্ধ করে দিয়েছে।

—আপনি এখন কি করতে চাইছেন ?

—আমি ঠিক করেছি ওদের আক্রমণ করব।

—এবং হারপুন নিয়ে। নেড বলে উঠল, 'অবশ্য আপনার যদি. আপত্তি না থাকে।'

—হ্যাঁ, তোমার সাহায্যের আমার প্রয়োজন আছে, নেড ল্যাণ্ড।

প্ল্যাটফর্মে উঠে নেড হারপুন বাগিয়ে ধরল। আমরা দেখলুম একটা অক্টোপাস তার একখানা পা জানলার ভেতর দিয়ে সাঁ করে ভেতরে গলিয়ে দিল। জাহাজের ওপরও তার অনেকগুলি পা ছিল। কুড়ুলের এক ঘা মেরে ক্যাপ্টেন নিমো একটি পা কেটে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে দুটি পা ক্যাপ্টেনের এক নাবিককে জড়িয়ে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল।

সে কী দৃশ্য। হতভাগ্য লোকটি অক্টোপাসের পায়ে আটকে থেকে শূন্যে ঝুলছে আর 'বাঁচাও বাঁচাও' চীৎকার করছে। ঐ সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে কে তাকে ছিনিয়ে আনবে! ইতিমধ্যে ক্যাপ্টেন ওই হিংস্র প্রাণীটার কাছে গিয়ে কুড়ুল দিয়ে তার আর একটা পা কেটে ফেললেন। অক্টোপাসটার মোট আটখানা পায়ের সাতটাই আমরা কেটে ফেলেছিলুম। একটি মাত্র পা দিয়েই ও নাবিকটাকে বেঁধে রেখেছিল। হঠাৎ বন্দী নাবিকটাকে নিয়ে অক্টোপাসটা অদৃশ্য হল। নটিলাসের চারপাশে তখন অক্টোপাস গিজগিজ করছে। নেড ল্যাণ্ড

পাগলের মত তার হারপুন দিয়ে এদের চোখের ওপর আঘাত করে চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একটা অক্টোপাস তার পা জড়িয়ে ধরে তাকে উল্টে ফেলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হল। এদিকে একটা কাট্‌ল মাছও তার ধারালো ঠোঁট নিয়ে এগিয়ে আসছে। হায় হায় এক্ষুণি ওর দেহটা দু' টুকরো হয়ে যাবে। কিন্তু ক্যাপ্টেন নিমো অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। তিনি সজোরে তাঁর কুড়ুল উঠিয়ে প্রথম কাট্‌ল মাছটার মুখে ও পরে অক্টোপাসটার পায়ে আঘাত করলেন।

মুহূর্তের মধ্যে নেড উঠে দাঁড়াল ও তার হারপুন কুড়িয়ে নিয়ে অক্টোপাসটার হৃৎপিণ্ডে বিঁধিয়ে দিল।

—একদিন তুমি আমায় বাঁচিয়েছিলে নেড, ক্যাপ্টেন বললেন, 'আজ আমি তার প্রতিদান দিলুম।' নেড কিছু বলল না শুধু একবার মাথা নুইয়ে সম্মান দেখালো ক্যাপ্টেনকে।

ক্লান্ত ও রক্তাক্ত শরীরে ক্যাপ্টেন নিমো সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখে জল। এই সমুদ্র আজ তাঁর এক প্রিয় সঙ্গীকে গ্রাস করেছে।

সাতাশ

২০শে এপ্রিলের সেই মর্মন্তুদ দৃশ্য আমরা কেউ ভুলতে পারিনি। ক্যাপ্টেন নিমো এই নিয়ে তাঁর দু দুজন সঙ্গীকে হারালেন। তিনি যে অত্যন্ত ভেঙে পড়ছেন তা নটিলাসের অবস্থা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। যে নটিলাসের তিনি ছিলেন প্রাণস্বরূপ, সেই নটিলাস এখন আর তার নির্দিষ্ট পথে যাচ্ছে না। একটা মৃতদেহের মত ভাসতে ভাসতে চলতে লাগল। এখন তার যাত্রা উত্তরের দিকে।

এদিকে নেড ল্যাণ্ড অধৈর্য হয়ে উঠেছিল। কী করে এখান থেকে পালানো যায় এই ছিল তার সারা দিনের চিন্তা। একদিন সে আমার

কাছে এসে বলল, 'শুনুন স্যার, আপনার এই নিমো আর ডাঙার দিকে না গিয়ে বোধহয় উত্তর মেরুর দিকে যেতে চান। কিন্তু আমি বলছি দক্ষিণ মেরুতে বেড়িয়েই আমার আশ মিটে গেছে। আমি আর উত্তরে যেতে চাই না। আমি যখনই ভাবি যে অল্পদিন পরেই নটিলাস নোভোস্কোশিয়া পৌঁছচ্ছে আর এই নোভোস্কোশিয়া থেকে সেন্ট লরেন্স নদী খুব একটা বেশী দূরে নয়। সেই নদী হল আমার নদী। এবং এই নদীর পাশেই হল কুইবেক শহর যেখানে আমার বাড়ি। একথা ভাবলেই আমার মাথা গরম হয়ে যায়। এই আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, আমি বরং সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব তবু এখানে থাকব না।'

—নেড তুমি কি চাও আমি ক্যাপ্টেন নিমোকে জিজ্ঞেস করি আমাদের সম্বন্ধে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কিন্তু তিনি তো আমাকে আজকাল এড়িয়েই চলেন।

—সেইজন্যেই আরও তাঁর সঙ্গে দেখা করা দরকার।

—বেশ। এই বলে আমি সোজা ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনে গিয়ে দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকে বললুম, 'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই, ক্যাপ্টেন।'

—কিন্তু আমি যে এখন কাজে ব্যস্ত।

তাঁর এই অভ্যর্থনা আমার কাছে মোটেই প্রীতিকর বলে মনে হল না। কিন্তু আজ আমি একটা বোঝাপাড়া করব বলেই তৈরি হয়ে এসেছি।

—ক্যাপ্টেন, আমি বললুম, 'আপনার সঙ্গে আমি এমন একটা বিষয়ে আলোচনা করতে এসেছি যাতে মোটেই দেরি করা চলে না।'

—সেটা কী রকম? ঠাট্টার সুরে বললেন তিনি, 'আপনি কি এমন কিছু আবিষ্কার করেছেন যা আমার চোখ এড়িয়ে গেছে, না কি সমুদ্র তার নতুন কোন গোপন তথ্য ফাঁস করেছে আপনার কাছে।'

তারপর আমার উত্তরের জন্যে প্রতীক্ষা না করে টেবিলের ওপর রাখা একটি পাণ্ডুলিপির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি

বললেন, 'এই যে দেখুন মঁসিয় এ্যারোনাক্স, এই পাণ্ডুলিপিতে আমার সমুদ্রচর্চা, আমার জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এটিকে এমন একটি বাক্সয় ভরা হবে যা জলের ওপর ভেসে থাকবে। আমি চাই আমার মৃত্যুর পর এই ইতিহাস যেন বেঁচে থাকে।'

আমার সর্বাঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ক্যাপ্টেনের জীবনের ইতিহাস! তাহলে একদিন তাঁর সম্পর্কের সব রহস্য উন্মোচিত হবে।

—ক্যাপ্টেন, আমি বললুম, 'আমি বা আমার সঙ্গীরা এই পাণ্ডুলিপি রেখে দিতে রাজী আছি, যদি আপনি আমাদের মুক্তি দেন।'

—মুক্তি, ক্যাপ্টেন হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এই বিষয় নিয়েই আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলুম। আজ সাতমাস আমরা এখানে আছি। আমাদের এখানে চিরকাল আটকে রাখাই কি আপনার উদ্দেশ্য?

—মঁসিয় এ্যারোনাক্স, এ প্রশ্নের উত্তর সাত মাস আগে আমি আপনাকে যা দিয়েছিলুম এখনও তাই দেব। একবার নটিলাসে এসে যে ঢোকে সে আর বাইরে যেতে পারে না।

—কিন্তু জানেন কি ক্রীতদাসদেরও তাদের স্বাধীনতা ফিরে পাবার অধিকার আছে?

—থাকতে পারে। কিন্তু আমিও আপনাদের দিয়ে কোন শপথ করিয়ে নিই নি।

—আমি আপনাকে আবার বলছি, এটা শুধু আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়। অধ্যয়ন বা গবেষণায় ডুব দিলে আমি আর সব কিছু ভুলে যাই। কিন্তু নেডের কথা আলাদা। তার কাছে এই সব জ্ঞানচর্চার কোন দাম নেই। সে ঘরে ফেরার জন্যে লালায়িত। হয়ত সে একদিন চেষ্টাও করবে—

ক্যাপ্টেন উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'নেড যদি কিছু ভাবে এবং তার জন্যে চেষ্টা করে তাতে আমার কি এসে যায়। আমি তো তাকে খুঁজে পেতে আনিনি। মঁসিয় এ্যারোনাক্স, আপনাকে আর

বলার আমার কিছু নেই। আপনার কাছ থেকে দ্বিতীবার এই বিষয়ে কিছু শুনতেও চাই না আমি।'

—এখন বুঝতে পারছি, আমার সঙ্গীদের সব কথা জানাতে নেড বলল, 'এই লোকটির কাছ থেকে আমরা কিছুই পাব না। নটিলাস লং আইল্যাণ্ডের কাছে যাচ্ছে। আর হাওয়া যে রকমই থাকুক ওইখানেই আমরা চম্পট দেব।'

কিন্তু আকাশের অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হতে লাগল। দিগন্তে মেঘ জমছে, সমুদ্রও ফুলে উঠছে। একমাত্র পেট্রেল পাখি, যা ঝড়ের সঙ্গী, তাছাড়া আর কোন পাখি দেখা গেল না। ১৯শে মে যেদিন নটিলাস লং আইল্যাণ্ডের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল সেদিন উন্মত্ত বিক্ষোভের সঙ্গে এই ঝড় সমুদ্রের ওপর ফেটে পড়ল। নটিলাস কখনও কাত হয়ে কখনও সোজা হয়ে এই তাণ্ডবের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। পাঁচটার সময় ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি শুরু হল। আমরা যত গভীর জলের দিকে এগুতে লাগলুম ঢেউয়ের শক্তি ও কলেবর ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। বেলা বারোটা নাগাদ নটিলাসের পক্ষে আর জলের ওপরে থাকা সম্ভব হল না। নটিলাস তখন নিচে নামতে শুরু করল। প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচে নামবার পর আমরা সমুদ্রের শান্ত, নিস্তব্ধ চেহারা দেখতে পেলুম।

এই প্রচণ্ড ঝড়ের ফলে আমাদের পুবদিকে চলতে হল। নিউ-ইয়র্ক কি সেণ্ট লরেন্সের ডাঙা দিয়ে পালানোর আশা একেবারে ঘুচে গেল। ফলে নেড মুষড়ে পড়ল আরও বেশী।

২৮শে মে তারিখে আমরা আয়ারল্যাণ্ডের ১২০ মাইলের মধ্যে এসে পড়লুম।

ক্যাপ্টেন নিমো কি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে নামবেন? না আমি লক্ষ্য করলুম যে তিনি ফের দক্ষিণ দিকেই যেতে লাগলেন। এখানে আমরা ডাঙার নিকটবর্তী হওয়ায় নেডকে আবার একটু আমাদের সঙ্গে দেখা যাচ্ছে। আবার সে আমায় ক্রমাগত প্রশ্ন করে চলেছে, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?' কিন্তু আমি কি বলব! ক্যাপ্টেন নিমো তেমনি

একা নিজের ঘরে রয়ে গেছেন। অল্পক্ষণের জন্যে নেডকে আমেরিকার তট দেখিয়ে এখন কি তিনি আমাকে ফ্রান্সের তীর দেখাতে চাইছেন?

এদিকে নটিলাসের দক্ষিণমুখো যাত্রা অব্যাহত রইল। ৩০ তারিখে সে ইংল্যাণ্ড ও সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেল। পরের দিন অর্থাৎ পয়লা জুন তারিখেও নটিলাস আগের মতই জলে চক্কর দিতে লাগল। স্পষ্টতই সে সমুদ্রে কোন একটা জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিল। মধ্যাকাশ পেরিয়ে যাবার অল্প আগে ক্যাপ্টেন তাঁর সেক্সট্যান্ট যন্ত্র দিয়ে সূর্যের অবস্থান লক্ষ্য করতে লাগলেন। আমি তখন প্ল্যাটফর্মে ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়িয়ে। খানিক পরে তিনি নিজের মনে বলে উঠলেন, 'এই সেই জায়গা।'

এই বলে তিনি নিচে নেমে গেলেন। আমিও সেলুনে ফিরে এলুম। নটিলাসের ওপরের ঢাকনি বন্ধ করা হল এবং ট্যাংকে জল ভরার হিস্ হিস্ শব্দ শুনতে পেলুম। নটিলাস নিচে নামতে লাগল। প্রায় ৫০০ ফুট নামার পর সে মাটির ওপর গিয়ে থামল। ঘরের আলো নিভে গেল এবং কাঁচের জানলাগুলি খুলে দেওয়া হল।

আমি বাঁ দিকে তাকালুম। কিন্তু নিস্তরঙ্গ সমুদ্র ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না। তবে ডানদিকে তাকিয়ে আমি দেখতে পেলুম এক প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ। খুঁটিয়ে দেখে অবশ্য বুঝলুম যে সেটি একটি মাস্তুলহীন জাহাজ। ভাঙা জাহাজটির ওপর যেভাবে বিভিন্ন পদার্থ স্তরে স্তরে জমে উঁচু হয়ে উঠেছে তাতে বোঝা যায় সেটি এখানে ডুবে যাবার পর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে।

একসঙ্গে অনেকগুলো চিন্তা আমার মনে ভিড় করে এল। এটা কাদের এবং কি জাহাজ ছিল। নটিলাসই বা হঠাৎ এই সমাধির কাছে এল কেন? চুপচাপ যখন এইরকম সাত পাঁচ ভাবছি এমন সময় ক্যাপ্টেন নিমো আমার কাছে এসে বললেন, 'আজ পয়লা জুন, ঠিক চুয়াত্তর বছর আগে এই মার্সেলাইস জাহাজটি ডুবে যায়। বিধ্বস্ত হবার আগে এই জাহাজের সৈন্য ও নাবিকেরা অশেষ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল। শেষে এর তিনটি মাস্তুল ভেঙে যায়, জাহাজের

খোলে জল ঢুকে যায় ; কিন্তু তবুও এর ২৫৬ জন নাবিক আত্মসমর্পণ করার চাইতে মৃত্যু শ্রেয় মনে করে জাহাজের পেছন দিকে তাদের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে হাসতে হাসতে জলের তলায় তলিয়ে যায়।'

আমি নীরবে এই রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে লাগলুম। ক্যাপ্টেন বললেন, 'জাহাজ তলিয়ে যাবার সময় সমস্বরে চীৎকার করে কি তারা বলেছিল জানেন ? বলেছিল, ফরাসী সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবী হোক ?

—আমার মনে পড়েছে, আমি জোরে বলে উঠলুম, 'পরে জাহাটির নাম দেওয়া হয়েছিল, এ্যাভেঞ্জার।'

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ্যাভেঞ্জার। ভারী সুন্দর নাম।

ইতিমধ্যে নটিলাস ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে এবং এভেঞ্জারের আকৃতি ম্লান হতে শুরু করেছে। একটু পরেই সামান্য ঝাঁকুনি লাগতেই বুঝলুম যে নটিলাস এখন জলের ওপরে। ঠিক সেই সময় বুম করে একটা আওয়াজ এল কানে। আমি ক্যাপ্টেনের মুখের দিকে তাকালুম।

—ওটা কী ক্যাপ্টেন ?

তিনি কোন কথা বললেন না। সেখান থেকে আমি প্ল্যাটফর্মের ওপর এসে উঠলুম। সেখানে নেড ও কনসীলের দেখা পেলুম।

—এই আওয়াজটা কোত্থেকে এল ? প্রশ্ন করলুম আমি।

—ওটা একটা গুলির শব্দ। জবাব দিল নেড।

দেখা গেল দূর থেকে একটা জাহাজ ক্রমশ নটিলাসের কাছে আসছে। তখন নটিলাস থেকে তার দূরত্ব হবে ছ'মাইল।

—ওটা কি জাহাজ নেড ?

—ওটা একটা যুদ্ধ-জাহাজ। জবাব দিল নেড, 'আরো কাছে এসে জাহাজটা যদি এই হতচ্ছাড়া নটিলাসকে ডুবিয়ে দেয় তবে বেশ হয়।

—নেড, ভাল করে দেখে বল দিখি, জাহাজটা কোন দেশের ?

ভুরু কুঁচকে জাহাজটাকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখে নেড বলল, 'আজ্ঞে, ওটা কোন দেশের জাহাজ তা আমি বলতে পারব

না, কেন না ওর গায়ে কোন নিশান নেই। তবে ওর সবচেয়ে বড় মাস্তুলটায় যে একটা ছোট নিশান পত্‌পত্‌ করছে, তাই দেখে আমি বুঝতে পারছি যে ওটা একটা যুদ্ধ জাহাজ।'

—জাহাজটা যদি আমাদের এক মাইলের মধ্যে আসে তাহলে মশাই আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দেব, তা কিন্তু বলে রাখছি। নেড বলল, 'আর আপনাকেও আমি সেই যুক্তিই দিচ্ছি।'

নেডের কথার কোন জবাব না দিয়ে আমি জাহাজটাকে লক্ষ্য করতে লাগলুম। জাহাজটা ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা যে দেশেরই হোক না কেন আমরা যদি একবার তাতে গিয়ে উঠতে পারি তাহলে নিশ্চয় তা আমাদের নিয়ে যেতে অস্বীকার করবে না। আমি এই রকম ভাবছি, এমন সময় জাহাজের সামনের দিকে খানিকটা সাদা ধোঁয়া উঠতে দেখা গেল আর তার একটু পরেই একটা দারুণ আওয়াজে আমাদের কানে যেন তালা লেগে গেল।

—আরে ওরা যে আমাদের দিকে কামান দাগছে! আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ওরা এই আজব জীবটিকে চিনতে পেরেছে আর তাই গোলা ছুঁড়ছে।

—কিন্তু এর ভেতরে যে মানুষ আছে সেটা নিশ্চয় ওরা দেখতে পাচ্ছে। আমি বলে উঠলুম।

—বোধহয় সেইজন্যেই ওরা আরও কামান দাগছে। বলল নেড।

নেডের এই কথায় আমার মাথায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তাইতো, এখন নিশ্চয় বাইরের দুনিয়ার লোক সেই অতিকায় দানবের আজগুবি গল্পে বিশ্বাস করে না। অ্যাব্রাহাম লিংকন থেকে নেড যখন নটিলাসকে তার হারপুন ছুঁড়ে মেরেছিল তখন ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন যে এই দাঁতাল তিমি আসলে একটি ডুবোজাহাজ। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে এই ধরনের ডুবোজাহাজ দাঁতাল তিমির থেকে অনেক বেশী ভয়ংকর। আর ঠিক সেই কারণেই এখন সমস্ত সভ্য দেশ এই সাংঘাতিক সমুদ্র-চরটিকে খুঁজে বার

করবার জন্যে সমুদ্রে সমুদ্রে সন্ধান করে ফিরছে। আর ক্যাপ্টেন নিমোও তো এই জাহাজকে তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার কাজে লাগাতে পারেন। যে রাত্রে ক্যাপ্টেন আমাদের তিনজনকে একটা প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রেখেছিলেন সে রাত্রে নিশ্চয় তিনি একটা জাহাজকে আক্রমণ করেছিলেন। ক্যাপ্টেন নিমোর রহস্যময় জীবনের একটা দিক উন্মোচিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর সঠিক ও সম্পূর্ণ পরিচয় এখনও জানা যায় নি। বরং এটুকু বোঝা গেছে তিনি কল্প-জগতের দৈত্য-দানব কিছু নন, বরং যাঁরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই সভ্য সমাজের একজন ঘোরতর বিদ্বেষী।

আমাদের চারপাশে তখন গোলাবর্ষণ হচ্ছিল। এক একটা গোলা জলে পড়ছিল আর জল লাফিয়ে উঠছিল। নটিলাসে কিন্তু একটাও লাগল না। এইরকম মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণ সত্ত্বেও ক্যাপ্টেন নিমো তখনও পর্যন্ত প্ল্যাটফর্মে আসেন নি। অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছিল। হঠাৎ নেড বলল, 'প্রফেসর, এই সংকট থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে কিছু করা দরকার।'

—কি করতে চাও?

—আসুন, আমরা ওদের আমাদের কাছে আসতে বলি, যাতে ওরা বুঝতে পারে আমরা নিরপরাধ ও সৎ।

নেড তার রুমালটা হাতে নিয়ে ওড়াবে বলে সেটা বার করল। যেই সে সেটা দেখাতে যাবে অমনি কার বজ্রমুষ্টির আঘাতে সে ডেকের ওপর পড়ে গেল। আমরা চমকে ফিরে ক্যাপ্টেন নিমোকে দেখতে পেলুম।

—নির্বোধ, দাঁতে দাঁত ঘষে তিনি গর্জে উঠলেন। তুই কি চাস যে ওই জাহাজটাকে আঘাত করার আগে নটিলাসের তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়ে তোকে শেষ করে দিই।

ক্যাপ্টেন নিমোর চোখ মুখ তখন সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে। তাঁর গলার স্বরও তেমনি বিকট। মুখ মড়ার মত সাদা, বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। নেডকে ছেড়ে দিয়ে ওই যুদ্ধ-জাহাজটার দিকে তাকালেন

তিনি। এবার সেই জাহাজটাকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন তিনি, 'পতাকা নেই বটে তবু আমি জানি ওটা কোন দেশের জাহাজ। এই, আমিও আমার জাহাজে পতাকা ওড়ালুম।'

ক্যাপ্টেন নিমো তাঁর নটিলাসের সামনের দিকে একটা কালোরঙের পতাকা উড়িয়ে দিলেন। দক্ষিণ সমুদ্রেও তিনি এইরকম পতাকা উড়িয়েছিলেন। ঠিক এই সময় ওই যুদ্ধ-জাহাজ থেকে নিক্ষিপ্ত একটি গোলা তির্যকভাবে নটিলাসের গায়ে প্রতিহত হয়ে জলে গিয়ে পড়ল।

ক্যাপ্টেন হঠাৎ আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন আর বললেন, 'যান আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে নিচে যান। যান, এথুনি।'

—ক্যাপ্টেন, আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, 'আপনি কি এই জাহাজটিকে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন?'

—আক্রমণ নয় মশাই, আমি ওটাকে ডুবিয়ে ছাড়ব। আর আপনাকে একটি উপদেশ দিই, আপনি আমার কাজের বিচার করতে আসবেন না। অদৃষ্টের ফেরে যা দেখে ফেলেছেন তা-ও আপনাদের দেখা উচিত ছিল না। যাক যথেষ্ট হয়েছে, এখন নিচে যান।

তাঁর আদেশ পালন করা ছাড়া আর আমাদের কোন গত্যন্তর ছিল না। প্রায় পনেরো জন নাবিক ক্যাপ্টেন নিমোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই ঘৃণাভাবে তাকিয়ে ওই জাহাজটার দিকে। নিচে নেমে যেতে যেতে আমি শুনতে পেলুম আরও একটা গোলা এসে নটিলাসের গায়ে লাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেনের চীৎকার শোনা গেল, 'যত পারিস গোলা ছোঁড়, উন্মাদ কোথাকার! নটিলাসের হাত এড়িয়ে তুই পালাবি কোথায়?' আমি আমার ঘরে চলে এলুম। ক্যাপ্টেন আর তাঁর সহকারী প্ল্যাটফর্মেই রয়ে গেলেন। নটিলাসকে চালানো হল এবং অতিশীঘ্রই তা ওই জাহাজের নাগলের বাইরে চলে গেল।

বিকেল চারটে বাজল। আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে আমি মাঝখানের সিঁড়িটার কাছে এলুম। ওপরের ঢাকনিটা খোলাই ছিল। সাহস বুক বেঁধে আমি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম। ক্যাপ্টেন

তখনও উত্তেজিতভাবে প্ল্যাটফর্মের ওপর পায়চারি করছিলেন। জাহাজটা তখনও নটিলাস থেকে পাঁচ ছ'মাইল দূরে।

আমার ইচ্ছে হল আমি ক্যাপ্টেনকে জিগ্যেস করি, কেন তিনি ওই জাহাজাটিকে আক্রমণ করার জন্যে এত উৎসাহী। কিন্তু আমি মুখ ফুটে কোন প্রশ্ন করার আগেই ক্যাপ্টেন স্বগতোক্তি করে উঠলেন, 'এখানে আমার কথাই আইন। ওরই জন্যে আমি আমার সব প্রিয় বস্তু আর পরিজনদের হারিয়েছি। আমি ওকে ধ্বংস করবই।'

আমি নিচে নেমে কনসীল আর নেডের কাছে এলুম। আমি ওদের বললুম আমরা এখান থেকে পালাবো।

—খুব ভাল কথা। নেড শুনে বলল, 'আমরা রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করব।'

আস্তে আস্তে রাত হল। সমস্ত জাহাজে এক অখণ্ড নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। আমরা ঠিক করলুম যে যুদ্ধ জাহাজটা যখন নটিলাসের খুব কাছে আসবে তখনই আমরা পালাবো। আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, এই বুঝি নটিলাস আক্রমণ করে। কিন্তু নটিলাস যেন এক খেলায় মেতেছিল। যেই জাহাজটা কাছে আসছিল অমনি নটিলাস গা-ঢাকা দিয়ে সরে পড়ছিল সেখান থেকে।

এইভাবে খানিকটা রাত কেটে গেল। আমরাও সুযোগের অনুসন্ধান করছিলুম। নেড তো এই সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় আর কি! আমি ওকে কোনোরকমে ধরে রেখেছিলুম। আমার মতলব ছিল নটিলাস যখন জাহাজটাকে আক্রমণ করবে সেটাই হবে পালাবার উপযুক্ত সময়।

রাত তিনটের সময় উদ্বেগাকুল মন নিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠলুম। ক্যাপ্টেন নিমো তখনও সেখান থেকে নামেন নি। জাহাজের সামনের দিকে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। হাওয়ায় তাঁর চুল উড়ছিল। চাঁদ তখন আকাশের একদিকে ঢলে পড়েছে এবং পূর্বদিকে সবে বৃহস্পতি উঠেছে। এই রকম শান্তিপূর্ণ দৃশ্যপটে আকাশ সমুদ্র দুই-ই সুন্দর ও স্বচ্ছ লাগছিল। বাইরে এমন প্রশান্তি অথচ নটিলাসের ভেতরে কত না উত্তেজনা, কত না হিংসা আর দ্বেষ।

ছ'টা পর্যন্ত আমি একই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম। এর মধ্যে একবারও ক্যাপ্টেন নিমো আমাকে দেখতে পান নি। জাহাজটা যখন আমাদের কাছ থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে তখন আবার নতুন করে গোলাবর্ষণ শুরু হল। এই আমাদের পালানোর উপযুক্ত সময়। আমি নেড আর কনসীলকে সজাগ করে দেব বলে নিচে নামলুম। নটিলাস তখন জলে ভাসছে।

পাঁচটার সময় গতি পরিমাপক যন্ত্র দেখে বোঝা গেল নটিলাস তার গতি কমিয়ে আনছে। ক্যাপ্টেন নিমো এইবার অক্রমণের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

বন্ধুগণ, আমি আমার দুই সঙ্গীকে উদ্দেশ করে বললাম, 'সুযোগ উপস্থিত। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন।'

নেড একেবারে তৈরিই ছিল আর কনসীলের কোন ভাবান্তর নেই। হঠাৎ ওপরের ঢাকনিটা সজোরে বন্ধ হয়ে যাওয়ার শব্দ শুনলাম। নেড সিঁড়ির দিকে ছুটে যাচ্ছিল, আমি তার হাত ধরে থামালাম। সেই অতি পরিচিত জলের হিস-হিস শব্দ শুনে বুঝলাম ট্যাংকে জল ভরা হচ্ছে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে নটিলাস জলের কয়েক গজ নিচে নেমে এল। এবার কি হবে বুঝতে পারলাম। জাহাজটাকে জলের ওপর থেকে আঘাত না করে নটিলাস তাকে নিচ দিয়ে আঘাত করবার ফন্দী করেছে।

নিজের ঘরে ফিরে এলাম আমি। মনটা কেমন অসাড় হয়ে গিয়েছে। শব্দ যত সামান্যই হোক, কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলাম। নটিলাসের গতি আগের চেয়ে দ্রুত হল। এইবার সে তীরবেগে ছুটে যাবে। গতির বেগে জাহাজটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। হঠাৎ আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। নটিলাস যে ছুটে গিয়ে জাহাটাকে আঘাত করেছে তা বুঝতে পারলাম। কাপড়ের ভেতর দিয়ে ছুঁচ গলে যাওয়ার মতন নটিলাস অক্লেশে এই জাহাজটির তলদেশ বিদীর্ণ করেছে।

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। পাগলের মত ঘর থেকে

বেরিয়ে সেলুনে ঢুকলাম। ক্যাপ্টেন নিমো সেখানে ছিলেন। জাহাজের কাচের জানলা দিয়ে তিনি কি দেখছিলেন। হঠাৎ জলের ওপর বিরাট ছায়া পড়ল। দশ গজ দূরে জাহাজের গায়ে আমি সেই বিরাট ফাটলটি দেখতে পেলুম, হু হু করে জল ঢুকছে সেখান দিয়ে। আমি নির্বাক বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখলুম। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটল। ভেতরের হাওয়ার চাপে জাহাজের ডেকটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। এর পর হতভাগ্য জাহাজটা আরো তাড়াতাড়ি ডুবতে আরম্ভ করল। জাহাজের নাবিকরা শেষ চেষ্টা হিসেবে মাস্তলটিকে আঁকড়ে ধরেছিল। সেই হতভাগ্যদেরও অবশেষে জলের তলায় তলিয়ে যেতে দেখলুম। অবশেষে নামল বড় মাস্তলটা, সেই সঙ্গে কয়েকটি মৃতদেহ।

আমি ক্যাপ্টেনের দিকে তাকালুম। উঃ, কী সাংঘাতিক প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি এই লোকটির। যখন সব শেষ হয়ে গেল তখন তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। একটা দেয়ালের শেষ দিকে পূজ্য ব্যক্তিদের প্রতিকৃতির মধ্যে আমি দেখলুম একটি শিশু ও যুবতীর ছবি। কয়েক মুহূর্ত তাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন। হঠাৎ তাদের দিকে তাঁর দুটি হাত প্রসারিত করে দিলেন তিনি, আর তারপরই আকুল কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

এরপর কয়েকদিন কেটে গেছে। নটিলাস আগের মতই কখনও জলের নিচে কখনও ওপরে ভেসে চলেছে। নটিলাস এখন কোনদিকে চলেছে কে জানে। জাহাজের ঘড়িগুলি তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাই সময়েরও কোন আন্দাজ পেলুম না। আর কতদিন ধরে আমাদের এই সমুদ্রযাত্রা চলবে কে জানে! ক্যাপ্টেন নিমোকে আমি কয়েকদিন দেখি নি, তাঁর কোন খবরও রাখি না। শুধু তিনি কেন তাঁর সহকারী বা জাহাজের অন্য লোকেরও মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

একদিন সকালে, মাস বা দিন কিছুই বলতে পারব না হঠাৎ কার ডাকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখি আমার মুখের ওপর ঝুঁকে কে ফিস্‌ফিস্ করে বলছে, আমরা এখান থেকে পালাচ্ছি।

সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে বসলুম।

—কখন? প্রশ্ন করলুম আমি নেডকে।

—আজ রাত্রে। নটিলাসে পাহারা দেওয়া বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে, এই সুযোগ।

—কিন্তু আমরা আছি কোথায়?

—ডাঙার কাছে। নেডের উত্তেজিত চাপা স্বর শুনলুম, আজ কুয়াশার মধ্যে তীর দেখতে পেয়েছি আমি।

—সেটা কোন দেশ?

—তা জানি না। কিন্তু যে দেশই হোক আমরা ওখানে গিয়ে আশ্রয় নেব।

—হ্যাঁ নেড, আমরা যাব। আমার সমস্ত সত্তা যেন বন্দিত্বের শেকল ছেঁড়বার জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে। 'আজই আমরা পালাব এবং তার জন্যে সমুদ্র যদি আমাদের গ্রাস করে তাতেও পরোয়া নেই।'

—আমি কি ঠিক করেছি জানেন? দাঁতে দাঁত ঘষে নেড বলল, 'যদি ধরা পড়ি ওদের সঙ্গে লড়াই করে মরব।'

—আমারও সেই কথা। মরি তো আমরা একসঙ্গে মরব।

নেড চলে যাওয়ার পর আমি একবার প্ল্যাটফর্মে উঠলুম। আকাশের অবস্থা ভয়ঙ্কর। দূরে স্থলের রেখা দেখা যাচ্ছে। আমার ভয় হচ্ছিল এসময় ক্যাপ্টেন নিমোর সঙ্গে দেখা না হয়ে যায়। দেখা হলে তাঁর প্রতি আমার যে ভয় তা নিশ্চয় গোপন করতে পারব না। আজকের দিনে নটিলাসে আমাদের শেষ দিনটা কত দীর্ঘ বলে মনে হচ্ছে। সাড়ে ছ'টার সময় নেড আমার ঘরে এসে বলল, দশটার সময় চাঁদ উঠবে না। সেই অন্ধকারের মধ্যে কাজ সারতে হবে আমাদের।

খুব মজবুত কাপড়ের তৈরি পোশাক পরে আমি তৈরি হয়ে নিলুম। আমার বুক ঢিপঢিপ করছিল। ক্যাপ্টেন নিমো যদি এই অবস্থায় আমায় দেখে ফেলেন তবে নিশ্চয় বুঝতে পারবেন আমি ভয়ঙ্কর কিছু একটা করতে যাচ্ছি। আমি ক্যাপ্টেনের ঘরের দরজায় কান পাতলুম।

বুঝলুম তিনি এখন ঘরেই আছেন। আমার মনে হচ্ছিল, এই বুঝি তিনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন।

বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম হাত পা ছড়িয়ে। শুয়ে শুয়ে আমি বিগত সব ঘটনাগুলো ভাবতে লাগলুম। সেই অ্যাব্রাহাম লিংকনে চড়ে সমুদ্র যাত্রা করা থেকে আরম্ভ করে টোরেস প্রণালী, পাপুয়া দ্বীপের অসভ্যরা, প্রবাল স্তূপের সমাধি পর পর সব ঘটনা ছবির মত ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে।

রাত সাড়ে নটা নাগাদ হঠাৎ অর্গানের সুর কানে এল আমার। একটা দুঃখের সুর, একটা মানুষ যেন পৃথিবীর সঙ্গে তার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করতে চাইছে। আমি কান পেতে শুনলুম আজ এই সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ক্যাপ্টেন তাঁর কোন অব্যক্ত কথাকে রূপ দিতে চাইছেন।

কিন্তু দশটা বাজতে বোধ হয় আর বেশী দেরি নেই। আমার সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হবার সময় হয়েছে।

আস্তে আস্তে পা টিপে হাঁটতে আরম্ভ করেছি। যত এগোচ্ছি আমার হৃৎপিণ্ড ততই দ্রুত চলতে আরম্ভ করেছে। সেলুনের ভেতরে গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে অর্গানের সুর বাজছে। ক্যাপ্টেন বাজনায় এমন তন্ময় হয়েছিলেন যে আমায় দেখতে পাননি। কার্পেটের ওপর গুঁড়ি মেরে এগুতে লাগলুম আমি। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে পৌঁছলাম অপর দিকের দরজার কাছে।

দরজাটা খুলতে যাব, এমন সময় ক্যাপ্টেনের এমন একটি গভীর শ্বাস পড়ল যে আমি এক মুহূর্তের জন্যে সেখানে দাঁড়িয়ে গেলুম। আমি বুঝতে পারলুম যে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। লাইব্রেরি ঘর থেকে অল্প আলো এসে পড়েছিল তাতেই আমি তাঁকে দেখতে পেলুম। হঠাৎ আবেগমথিতকণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'অনেক হয়েছে, হে সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ! আর না।

একি তাঁর অনুশোচনা ? বিবেকের দংশনে জর্জরিত হয়ে এইভাবে কি তিনি তাঁর সান্ত্বনা খুঁজে বেড়াচ্ছেন ?

কিন্তু আমার সময় ছিল না। চোখ কান বুজে আমি লাইব্রেরি

পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলুম। তারপর প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে কোনরকমে পৌঁছলুম নৌকায়। নেড আর কনসীল আগেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছে।

—চল, আর দেরি নয়। আমি চীৎকার করে বললুম।

—আমরা প্রস্তুত, নেড আমার কথার প্রতিধ্বনি করল।

সবে নেড নটিলাসের বাঁধন থেকে নৌকোটা খুলছে এমন সময় একটা গোলমাল শোনা গেল। কাদের চিৎকারও কানে গেল। ব্যাপার কি ?

মুখে কিছু না বলে নেড আমার হাতে একটা ছুরি গুঁজে দিল।

—হ্যাঁ, আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, আমরা জানি কি ভাবে মরতে হয়।

নেড তখন নৌকোর কাজ বন্ধ রেখেছে। আমি শুনলুম নটিলাসের সব নাবিক একই কথা বলে চেঁচামেচি করছে। বুঝতে পারলুম যে আমরা তাদের চীৎকারের কারণ নই। অন্য কিছুর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

আর সেটা যে কি, তা বুঝতে পেরেই আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, ঘূর্ণি ! ঘূর্ণি !

নরওয়ের এই অঞ্চলে ঘূর্ণি বা জলাবর্ত যে কী সাংঘাতিক তা সবারই জানা।

তাকিয়ে দেখলুম দূরে সব দিক থেকে হু হু শব্দে বিরাট বিরাট সব ঢেউ ছুটে আসছে। সমুদ্রের মাঝখানে এসে সেই জলরাশি প্রবল বেগে ঘূর্ণিত হচ্ছে। এই ঘূর্ণির টানের ব্যাপ্তি বারো মাইল পর্যন্ত। এই টানের চোটে শুধু জাহাজ নয়—তিমি এমন কি উত্তরাঞ্চলের সাদা ভল্লুক পর্যন্ত প্রাণ হারায়।

নটিলাস উত্তর দিকে যাবার চেষ্টা করছে। আমাদের নৌকোটা তখনও নটিলাসের সঙ্গে বাঁধা। তাই নটিলাস চলবার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও তার পেছনে পেছনে চলতে হল।

ভয়ে আতঙ্কে আমাদের প্রাণ কোথায় উড়ে গিয়েছিল। গা দিয়ে দরদর করে ঘাম বইছিল। চারদিক থেকে প্রচণ্ড শব্দ যেন কানে তালা

লাগিয়ে দিতে চাইছিল। বড় বড় ঢেউ পাথরের ওপর প্রবল শব্দে পড়ছিল আছড়ে।

নটিলাস এই ঘূর্ণির সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছিল। হঠাৎ এর লোহার শরীরে কেমন কড় কড় আওয়াজ শোনা গেল। 'ভাল করে ধরুন' নেড চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা যদি নটিলাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারি, তাহলে হয়ত এ যাত্রা বেঁচেও যেতে পারি।'

তার কথা শেষ হতেই এক প্রচণ্ড কান-ফাটা শব্দ শোনা গেল। আমাদের নৌকো নটিলাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তীরবেগে ছুটে গেল ঘূর্ণির দিকে।

ঠিক এই সময় একটা লোহার টুকরোয় আমার মাথা ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারালাম আমি।

এইভাবে আমাদের দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রা শেষ হল।

জ্ঞান হতে চোখ মেলে দেখি এক জেলের কুটিরে শুয়ে আছি। জায়গাটা লফোডন নামে এক দ্বীপ। আমার দুই সঙ্গী আমার দু পাশে বসে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরলুম।

আমার এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে আমি কোন ঘটনা বাদ দিই নি এবং কোন তথ্যকে অতিরঞ্জিতও করিনি। আমার কথা লোকে বিশ্বাস করবে কি করবে না সেটা বড় কথা নয়। আমি জানি যে, সমুদ্রে আমি দশ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে কুড়ি হাজার লীগ ঘুরে এসেছি। সেই সমুদ্র আর তার নিচের জগতের বিচিত্র জীবন-স্পন্দিত জগৎ সম্বন্ধে কিছু বলবার অধিকার আমার আছে।

কিন্তু নটিলাসের কি হল? ঘূর্ণির প্রচণ্ড চাপ সহ্য করে তা কি টিকে থাকতে পেরেছিল? ক্যাপ্টেন নিমো কি এখনও বেঁচে আছেন? এখনও কি সমুদ্রের তলায় থেকে তাঁর প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন? নাকি সেই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের পর তাঁর সে শখ ঘুচে গেছে চিরকালের মত?

যদি ক্যাপ্টেন জীবিত থাকেন তাহলে ভগবান যেন তাঁর মন থেকে তাঁর ঘৃণাকে দূরীভূত করেন। সমুদ্রের অজস্র রূপ-রহস্য দেখেই যেন

তিনি মুগ্ধ থাকেন, আর কোন জাহাজের অনিষ্ট-সাধনের চিন্তা যেন তাঁর মনে না আসে। বিচার বুদ্ধির চেয়ে দার্শনিক চিন্তাধারাই যেন প্রবলতর হয়ে ওঠে তাঁর মনে। তাঁর জীবন ও চরিত্র যেমন অদ্ভুত, তেমনি মহৎ।

তাঁর সঙ্গে থেকে আমি দেখেছি তাঁকে, আর এক দূর ও গভীর সত্যকে, অন্তহীন সমুদ্রের অতলে ডুব না দিলে যে, সত্যের উপলব্ধি মানুষের ঘটে না।

ঠিক যেন ডাইনি বুড়ির দাঁতের পাটি। সার বেঁধে বসানো কামান-গুলো দেখলে সেইরকমই মনে হয়। কামানগুলোআবার বসানো আছে এক সিংহের মুখে। জিব্রালটারের অতিকায় পাহাড়। ঠিক যেন লাফ দিতে উদ্যত এক পশুরাজ।

এখানে ইংরেজের অপ্রতিহত প্রভুত্ব। স্পেনের বাসিন্দারা এখানে ইংরেজের প্রজা। ইংরেজ তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে পেরেছে প্রধানত ভৌগোলিক কারণে। জল কিংবা স্থল কোনদিক থেকেই জিব্রালটারকে ফের দখল করে নেওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু সেই পরাধীন স্পানিয়ার্ডদের মধ্যে এমন একজন ছিল যার বুকের মধ্যে জ্বলত ধিকিধিকি আগুন। ইংরেজের হাজার ভ্রূকুটিতে নেভানো যেত না দেশপ্রেমের সেই দীপ্তশিখা। দলপতি ছিল সে একটি দলের। সে এক অদ্ভুত দল। লোকটার খ্যাপামির বহর দেখে লোকে হাসত। প্রবল পরাক্রান্ত ইংরেজকে সে কিনা হটিয়ে দেবে এই এলাকা থেকে, মাত্র ওই কয়েকটি অনুচরের সাহায্য নিয়ে।

তারপর একদিন সে কোথায় চলে গেল। সেই যে গেল আর কেউ তার খোঁজ পেল না। দেখতে দেখতে দশটা বছর কোথা দিয়ে কেটে গেল। তবু এই নিরুদ্দিষ্ট মানুষটার কোন হদিস পাওয়া গেল না। সকলেই ধরে নিল সে দেশান্তরী হয়েছে বরাবরের জন্যে।

আসলে জিল কিন্তু কোথাও যায় নি। সে ছিল তার সাতপুরুষের ভিটেতেই। আদিম মানুষের জীবন বেছে নিয়েছিল সে। ঘন জঙ্গল আর পাহাড়ের গুহায় দিন কাটাত। এর মধ্যে একটা গুহা ছিল তার সবচেয়ে পুরনো বাসস্থান। এর নাম সান মিগেল। গুহাটা পাহাড়ের ভেতর নানা ঘুরপথে গিয়ে শেষ হয়েছে সমুদ্রে। এটা ছিল তার মনের মত আস্তানা।

সবাই যে ধরে নিয়েছিল জিল বেঁচে নেই তা কিন্তু একদিক থেকে সত্যি। তার মানুষের জীবন সত্যিই শেষ হয়েছিল। যে জিল বেঁচে আছে তাকে মানুষ না বলে পশু বলাই ঠিক হবে।

প্রায় সাতশো জনের একটি দল। তাদের আকৃতি লম্বা নয়, কিন্তু তারা সবল ও নমনীয়। এমন ক্ষিপ্র ভঙ্গীতে হাঁটুতে ভর দিয়ে লাফ দেয় যে তাকিয়ে দেখতে হয়।

এই এখন সূর্যাস্তের ম্লান আলোয় তাদের দেখাচ্ছে দৃঢ়বদ্ধ একদল সেনানীর মত। পশ্চিমে পর্বতমালার ওপরে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। সূর্য যত পশ্চিমে চলছে উপত্যকায় অন্ধকার তত গাঢ় হচ্ছে। উপত্যকার একদিকে সানোরে আর বোনডা গিরিশ্রেণী, অন্যদিকে রুক্ষ কুয়েরভো।

ওই পাহাড়ের চুড়োর ওপর দাঁড়িয়ে তাদের নেতা। দূরের পাহাড়-চূড়ার নাম গ্রেটরক। ওখানে আছে সামরিক বাহিনীর একটি ঘাঁটি। অষ্টপ্রহর কড়া নজর রাখে তারা এই এলাকার ওপর। শহরে ঢোকার এটাই একমাত্র পথ। দুর্গম ও গোপন। কিন্তু ওপর থেকে পাহাড়ের তলায় কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নজরে পড়ার কোন উপায় নেই।

নেতার গড়ন লম্বা। গায়ে বানরের চামড়ার পোশাক। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গোড়ালিটা ঘোড়ার খুরের মত শক্ত। সব মিলিয়ে যেন এক সঙ।

যেখানে সে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে হাত বাড়িয়ে সে তার দলের সঙ্গীদের পাহাড়ের নিচের খাঁজটা দেখাল। অমনি গোটা দলটা এক ভঙ্গীতে বাড়াল তাদের হাত। নেতা তার হাতটা নামিয়ে নেওয়া মাত্র তারাও নামিয়ে নিল হাত। নেতা মাটির দিকে ঝুঁকল। তারাও করল অবিকল সেই এক ভঙ্গী। এবার নেতা লাঠি তুলে শূন্যে নাড়াল। গোটা দলটা নিজেদের হাতের লাঠি নাড়াল শূন্যে।

এরপর তাদের এগিয়ে যাওয়ার পালা। এ যাত্রায়ও নেতা তাদের গাইড। সে ঝোপের মধ্যে লাফ দিয়ে ঢুকে গাছের তলা দিয়ে এগুতে লাগল বুকে হেঁটে। বাহিনীও এগুতে লাগল একই ভঙ্গীতে।

দশ মিনিটের মধ্যে তারা নেমে এল পাহাড়ে পথে। এমন সুশৃঙ্খল তাদের এই কুচকাওয়াজ যে একটিও পাথর গড়িয়ে পড়ল না পাহাড়ের গা বেয়ে। কোথাও শব্দ হল না এতটুকু।

নেতা থমকে দাঁড়িয়েছে। মুহূর্তে বাহিনীও গেল দাঁড়িয়ে। এখন দেখলে মনে হবে কে যেন তাদের পাথরে রূপান্তরিত করেছে।

শহরটা এখান থেকে প্রায় দুশো গজ নিচে।

ওখানে মানুষজন থাকে। ছবির মত বাড়ি, বাংলো, ডাকঘর আর হাসপাতাল। দেওয়ালীর মালার মত আলো জ্বলছে। তার আরও দূরে দেখা যাচ্ছে রণপোত, সওদাগরি জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে পোতাশ্রয়ে। আরও দূরে অয়রোপা অন্তরীপ ; তার শেষ মাথার বাতিঘরের আলো সমুদ্রের বুকে পড়েছে তির্যক হয়ে। সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ এক ছবি।

নিস্তব্ধতা ভেঙে গর্জন করে উঠল কামান। তোপ দাগা হল গুপ্ত গোলন্দাজ বাহিনীর কামান থেকে। তারপরেই শোনা গেল গুম্ গুম্ ঢাকের শব্দের সঙ্গে কান ফাটানো ঝাঁঝরের বাদ্যি।

এটা একটা সংকেত। এই তোপ দাগার পর কোন বিদেশী মানুষের আর বাইরে থাকার হুকুম নেই। একটু পরেই সেপাইরা বেরুবে পথে টহল দিতে। উটকো কোন লোক পথে দেখলেই পাকড়াও করবে তাকে। সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারলে তাদের কপালে হাজত বাস।

না, আজ আর কোন গোলমাল নেই কোথাও। চারদিক শান্ত আর অদ্ভুত নির্জন। এই তল্লাটের সকলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জেনারেল ম্যাকাকমেল তাঁর কোয়ার্টারে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন।

আরও একটা রাত নিশ্চিন্তে কাটবে তাঁর। সমস্ত জিব্রলটারে অশান্তির এতটুকু ছায়া নেই। কোথাও কোন বিপদের সংকেত চোখে পড়ছে না।

কিন্তু না, সে রাতে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম লেখা ছিল না জেনারেলের কপালে।

দেখবার মত চেহারা বটে ম্যাকাকমেলের। হাত দুটি বেঢপ লম্বা,

ঘন লোমশ ভুরু, তার নিচে কুতকুতে একজোড়া চোখ, থুতনিতে একছিটে দাড়ি, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে হাত পা নাড়েন। একজন ইংরেজ জেনারেলকে এর চেয়ে কিছুটা কম কদাকার দেখালেই মানাতো ভাল।

মানুষের উদ্ভব যে বানর থেকে সেটা জেনারেলকে একনজর দেখলেই টের পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, চেহারার দিক থেকে ঈশ্বর ওঁকে বানরের আদলে গড়লে কি হয়, যুদ্ধবিদ্যায় ওঁর পটুত্ব অসাধারণ। তেমনি প্রখর বুদ্ধি। বোধহয় এই গুণ দিয়েই সৃষ্টিকর্তা পুষিয়ে দিয়েছেন ওঁর আকৃতির ত্রুটি।

এই ম্যাকাকমেল যখন সে রাতে সুখনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন তখন আচমকা মস্ত আওয়াজ করে খুলে গেল তাঁর ঘরের দরজা। আর প্রায় লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল তাঁর বেয়ারা। চীৎকার করে ডাকল, 'হুজুর'!

দরজা খোলার শব্দেই বিছানার ওপর উঠে বসেছিলেন জেনারেল, চেঁচিয়ে জিগ্যেস করলেন, কি ? কি হয়েছে ?

—শহর আক্রান্ত হয়েছে সার। উত্তেজিত, চাপা কণ্ঠস্বর তাঁর বেয়ারা-কাম-এডিকংয়ের।

—কারা ? কাদের এই দুঃসাহস ?

—মনে তো হচ্ছে স্পেনেরই অধিবাসী।

তড়াক করে লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নিচে নামতে নামতে জেনারেল শুনলেন বাইরে প্রচণ্ড হৈ চৈ। যোদ্ধার পোশাক পরতে পরতে শুধোলেন, 'এত শোরগোল কিসের ?'

—পাথর পড়ছে স্যার। বৃষ্টির মত পাহাড়ের ওপর থেকে ছোট বড় পাথর গড়িয়ে পড়ছে গোটা শহরে।

—হুম্, হেলমেটটা মাথায় বসাতে বসাতে গম্ভীর মুখ করেন জেনারেল, 'অনেক লোক জুটিয়েছে ওরা। সব মাতাল, ভবঘুরে আর জোচ্চোর সকলকে একজোট করে হামলা করছে ওরা। ভাল কথা, গভর্নরকে খবর দেওয়া হয়েছে ?

—সে উপায়ই নেই স্যার। এ রাস্তা পেরিয়ে অয়রোপা অন্তরীপে

যাওয়াই যাচ্ছে না। সব ফটকগুলো শত্রুদের দখলে, পথ-ঘাট শত্রুসৈন্যে ভরা।

ব্যাপারটা আচম্বিতে ঘটেছে বলেই ইংরেজ সৈন্য বড় বেশী বেকায়-দায় পড়ে গিয়েছে। জেনারেলের কুৎসিত মুখ আরও কদাকার দেখায় যেন।

—আর ওয়াটার পোর্টের শিবির! কোমরে বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে প্রশ্ন করেন তিনি, সেটার কি অবস্থা?

—সেখানকার অবস্থাও সঙ্গীন। গোলন্দাজরা সবাই বন্দী হয়ে আছে শিবিরে।

—হুম্। তোমার সঙ্গে কজন লোক আছে?

—জনা কুড়ি হবে স্যার।

—তা বলে কি হার মানতে হবে, বিড়বিড় করে এই কথা ক'টি বলেই গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে ওঠেন জেনারেল ম্যাকাকমেল, 'না, কখনই নয়। কতকগুলো হাভাতে ভিখিরির কাছে ইংল্যাণ্ডের আত্মসমর্পণ। না—'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের দরজা দুম্ করে খুলে যায়। লাফিয়ে ভেতরে ঢোকে এক জীব। যেমন অদ্ভুত তার আকৃতি তেমনি বিতিকিচ্ছিরি তার ধরনধারণ। সোজা জেনারেলের কাঁধের ওপর পড়ে সে লাফ দিয়ে। ক্রুদ্ধ পশুর মত চীৎকার করে হুমকি দেয়, এখুনি আত্মসমর্পণ করো।

ব্যাপারটা আকস্মিক। জেনারেল এমন হকচকিয়ে যান যে বাক্যি হরে যায় তাঁর। এডিকংয়ের পেছনে ম্যাকাকমেল সাহেবের যে দু চারজন অনুচর ছিল বাতির আলোয় আগন্তুককে শনাক্ত করতে পেরে আতঙ্কে চীৎকার করে ওঠে তারা।

—জিল ব্রাল্টার! এ কোত্থেকে এল?

হ্যাঁ সে-ই। সেই বুনো বানর বেশী। সান মিগেলের গুহার সেই বর্বর। দল পাকিয়ে সে-ই এই আক্রমণ করেছে, তার দৌরাত্মিতে ইংরেজ জেনারেলের নাজেহাল অবস্থা এখন।

ওদের বিস্ময় বিমূঢ় অবস্থাটা এখনও কাটে নি এরই মধ্যে বর্বরটা ফের ধমক দিয়ে উঠেছে, 'করবে আত্মসমর্পণ ?'

—না, কখনও না, স্বদর্পে উত্তর দিয়েছেন অকুতোভয় ইংরেজ জেনারেল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জেনারেলের যে গুটিকতক অনুচর ভেতরে ছিল তারা ঘিরে ফেলেছে জিল ব্রান্টারকে। অবস্থা বেগতিক দেখে সে অমনি শিস্ দিয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ অথচ বিলম্বিত শিস। আর অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে বানরে ভরে যায় জেনারলের কোয়ার্টার।

এরা ইংরেজদের আসার আগে এই পাহাড়ের মালিক ছিল। ঘুরে বেড়াত গিরিচূড়া আর উপত্যকার যেখানে খুশী। তখনও স্পেনের লোকরা এখানে আসে নি। ক্রমওয়েল এই পাহাড়টার ওপর তখনও হাত বাড়াবার কথা স্বপ্নে ভাবেন নি, তখন এরাই ছিল এই অঞ্চলের আদিম বাসিন্দা। এখানকার মাটি, পাথর আর খোলা হাওয়ার সঙ্গে এদের বন্ধুত্ব বহুকালের।

এই দুর্ধর্ষ, ক্ষিপ্র জীবগুলো নিয়েই তৈরি হয়েছে জিল ব্রান্টারের বাহিনী। এদের স্পর্শ করার সাহস কারুর নেই। এই বাহিনীর একজনেরও গায়ে হাত লাগলে লোকে দেখেছে এরা প্রতিশোধ নিয়েছে অদ্ভুত পন্থায়। একের পর এক পাথর গড়িয়ে নিষ্ঠুরভাবে তারা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে শুধু আঘাতকারী নয় আরও অনেককে।

আজ এদের যে দলপতি সেই জিল ব্রান্টার সে এই এলাকায় বানরদের মতই করতো। সারা জীবন তার মাথায় একটাই চিন্তাই ছিল, কি করে ইংরেজদের হটানো যায় স্পেনের মাটি থেকে। ওরা বিদেশী, ওরা আক্রমণকারী, ওদের উচ্ছেদ করতেই হবে এই ছিল প্রতিজ্ঞা।

যদি সত্যিই ইংরেজদের পাততাড়ি গুটোতে হয় এখান থেকে তবে কি লজ্জা ! যে ইংরেজ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, যারা জয় করেছে ভারতবর্ষ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ছাড়া আরও কত ছোট বড় দেশ—শেষে কিনা তাদের হার মানতে হবে একপাল বানরের কাছে।

এ লজ্জা সহ্য করা জেনারেল ম্যাকাকমেলের মত দুর্ধর্ষ সেনাধক্ষ্যের পক্ষে সম্ভব নয়। এদের কাছে হার মানার আগে তিনি নিজের রিভলভারের গুলিতে নিজের মাথার খুলি উড়িয়ে দেবেন। অপমান নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে সে মৃত্যু বরং শ্রেয়।

জিল ব্রাল্টারের ওই তীব্র শিস শুনে বানররা ঘরে ঢোকার আগেই কয়েকজন তাদের নেতার ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল। জিল ব্রাল্টারের গায়ে যেন মত্ত হাতির বল। কিন্তু একা অতগুলো সৈন্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সহজ নয়। ওরা তাকে কাবু করে তার বানরের খোলসটা টেনে-হিঁচড়ে খুলে তাকে প্রায় উলঙ্গ করে ঘরের কোণে চেপে রাখে। তার হাত পা তখন বাঁধা, মুখে কাপড় পোরা। একটু পরে জেনারেল বেরিয়ে এলেন, বাইরের অবস্থা সরেজমিনে দেখবার জন্যে।

বাইরে তখন সমূহ বিপদ। সৈন্যরা ওয়াটারপোর্ট তোরণের কাছে দাঁড়িয়ে প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে এখন ছুটে আসছে জেনারেলের কোয়ার্টারের দিকে। কিন্তু বানররা সংখ্যায় অগুন্তি! মরীয়া হয়ে লড়ছে আজ তারা। জিব্রাল্টারের দুর্ভেদ্য দুর্গ আজ বুঝি বেহাত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সৈন্যরা পিছু হটবার উদ্যোগ করছে। এখন যদি এস্পানিরা বানর-বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলায় তবে সব ছেড়েছুড়ে পালাতে হবে। কেল্লা, ছাউনি, সৈন্যদের ব্যারাক পড়ে থাকবে ফাঁকা।

এমন একটা অবস্থা কল্পনাই করা যায় না। অন্তত জেনারেল ম্যাকাকমেল তো পারেনই না।

মশাল জ্বলছে। তার আলোয় দেখা গেল বানর বাহিনী পিছু হটছে। সবার আগে রয়েছে তাদের নেতা। লাঠি উঁচিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে সে তাদের কুচকাওয়াজের। আর বিপুলসংখ্যক বানর তাকে হুবহু নকল করতে করতে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে ছুটে ছুটে।

জেনারেলের ঘর থেকে বেরুল কি করে জিল ব্রাল্টার? হয়ত,

দাঁতের কামড়ে দড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে সে। যা জেদ আর শারীরিক ক্ষমতা তার, অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু কোন দিকে যাচ্ছে সে এখন ?

অয়রোপা অন্তরীপের দিকে ? রাজ্যপালের বাড়ি চড়াও হয়ে তাঁকে বলবে আত্মসমর্পণ করতে ?

কিন্তু একি ! ওরা যে চলে যাচ্ছে শহর ছেড়ে। আলামেদা তোরণ পেরিয়ে এঁকেবেঁকে নেতা চলল পাহাড়ের ঢালের দিকে। পেছনে তার অনুগত বানর সেনা।

এক ঘণ্টা পরে আর একটিও আক্রমণকারী রইল না জিব্রাল্টারে।

ঘটনাটা তাহলে কী ?

সেটা পরিষ্কার জানা গেল তখনই. যখন জেনারেল ম্যাকাকমেল এসে দেখা দিলেন পার্কে।

সেই উন্মাদের ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনিই। ছলে বলে কৌশলে শত্রুকে পরাস্ত করাই ইংরেজের নীতি। সেই নীতি অনুসরণ করে-ছিলেন তিনি আজ। বানর সেনাকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন শহর থেকে পাহাড়ের কোলে। ছদ্মবেশ নিখুঁত হয়েছিল তাঁর। বানরের চামড়াটা ছিল গায়ে। চেহারাটা বানরের মত বলে সহজেই ঠকানো গিয়েছিল বানরদের। তারপর যা হয়েছে তা তো স্বচক্ষে দেখেছে সকলে।

হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গিয়েছিল। বুদ্ধিতে এত সহজে কিস্তিমাৎ করা বুঝি রাজভক্ত কর্মচারীর পক্ষেই সম্ভব। এই বুদ্ধি আর সাহসের জন্যেই আজ সেন্ট জর্জের ক্রশ পাওনা হল তাঁর।

জিল ব্রাল্টারের ভাগ্যে কি হল ? নগদ দামে ইংল্যাণ্ড তাকে বিক্রি করে দিল এক সার্কাসের দলকে। ইয়োরোপ, আমেরিকার নানা শহরে খেলা দেখিয়ে বেড়ায় সে এখন। লোকের ভিড় বাড়ানোর জন্যে সার্কাসের মালিক আবার রটিয়ে দিয়েছে এটা সান মিগেলের সেই বুনোটা নয়, আসল জেনারেল ম্যাকাকমেল।

কিন্তু সেই একবারের আক্রমণেই টনক নড়ল ইংরেজ সরকারের।

এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিল। এখন থেকে জিব্রাল্টারে পাঠাবে তার সবচেয়ে কুৎসিত দেখতে জেনারেলকে। যাতে দরকার হলে আরও একবার ঠকানো যায় এই শৃঙ্খলাবদ্ধ বানরবাহিনীকে।

কেন না এটা এমন একটা জায়গা যেখানে মানুষের দখলদারী নির্ভর করবে বানরদের দয়ার ওপর। তাদের ওপর টেক্কা দিতে শুধু বুদ্ধিমত্তা বা রণনিপুণতা যথেষ্ট নয়, চেহারার দিক থেকে তাদের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকাটা একান্ত দরকার।

তুষারে পদচিহ্ন

—কার পায়ের ছাপ এগুলো? এখানে মানুষ এল কোথা থেকে?

আজ ৪ঠা জুলাই। সারা দিন কুয়াশা। এমন কুয়াশা যে তিন হাত দূরের লোককে দেখতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। প্রতি পদক্ষেপে ওদের থামতে হচ্ছিল। বরাতজোরে এখনও পর্যন্ত কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি। শুধু বেল বরফের ওপর হাঁটবার বিশেষ জুতোজোড়া হারিয়ে ফেলেছিল।

এই ইংরেজ অভিযাত্রী দলের সদস্য সংখ্যা পাঁচ। এদের লক্ষ্য উত্তর মেরু আবিষ্কার করা। দীর্ঘ যাত্রার এই পর্বে ক্লান্ত যাত্রীর দল যেখানে এসে পৌঁছেছে তার চতুর্দিকে সাদা বরফ।

—আমার ধারণা ছিল, জনসন বলল, যে টেমস নদীর কুয়াশা কি বস্তু তা আমরা জানি। কিন্তু এখন দেখছি সে অভিজ্ঞতাটা কিছুই নয়।

—এখন দেখছি মশাল জ্বালানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। চারিদিকে তাকিয়ে হতাশ কণ্ঠে মন্তব্য করলেন ডাক্তার ক্লবোনি।

—কিন্তু মশাল জ্বালানো যায় কি করে? জিগ্যেস করল বেল।

মিনিট পনের জিরিয়ে নিয়ে ছোট দলটি আবার এগিয়ে যেতে লাগল। আর্দ্র কুয়াশায় ঢাকা আবহাওয়ার মধ্যে দিয়ে চলেছে ওরা, হাতে মশাল। লাঠির মাথায় পাট জড়িয়ে সেগুলো মদে চুবিয়ে

আগুন ধরিয়ে মশাল বানানো হয়েছে। মদে স্পিরিট মেশানো থাকে বলেই মশালের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে। ছ তারিখ পর্যন্ত এইরকম যাত্রাই চলল। এসময় হঠাৎ ঠাণ্ডা গেল বেড়ে। আর বাতাস সব কুয়াশা উড়িয়ে নিয়ে গেল। ডাক্তার ক্লবোনি হিসেব করে দেখলেন যে কুয়াশা থাকার দরুন তাঁরা দিনে মাত্র আট মাইল করে পথ হাঁটতে পেরেছেন। এটা পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে ছ তারিখে তাঁরা একটু সকাল সকালই বেড়িয়ে পড়লেন। আল্টামন্ট আর বেল এগিয়ে হাঁটছিল। আবহাওয়া এখন খুব তাড়াতাড়ি পরিষ্কার হয়ে উঠছে। শ্লেজে-চড়া গাইডদেরও এখন দেখা যাচ্ছে পেছন থেকে। ডাক্তার তাদের ওপর নজর রেখেছিলেন। হঠাৎএক সময় তারা থেমে যেতে তিনি অবাক হলেন। ডাক্তার দেখলেন, তারা মাটিতে ঝুঁকে কি দেখছে। হঠাৎ এমনভাবে তারা উঠে দাঁড়াল যে তাদের দেখে মনে হল তারা কিছু আবিষ্কার করে অবাক হয়েছে।

—কি, ব্যাপার কি? অবাক হয়ে শুধোলেন ডাক্তার।

—ওরা কোনো প্রাণীর পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছে। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস বললেন।

—তা কি সম্ভব! এখানে প্রাণী আসবে কোথা থেকে? বিস্ময় প্রকাশ করলেন ডাক্তার।

—কেন, এটা এত অসম্ভব ভাবছেন কেন?

—না, কোন প্রাণী যদি এখানে থাকত তাহলে ডিক নিশ্চয় ঘেউ-ঘেউ করে উঠত।

—কিন্তু ওরা যে পায়ের ছাপের দিকেই তাকিয়ে আছে সেটা এক রকম আমি নিশ্চিত।

—চলুন, পা চালিয়ে গিয়ে দেখা যাক, ব্যাপারটা কি।

জনসন কুকুরগুলোকে জোরে ছোটানোর জন্যে মুখে একরকম শব্দ করল। মিনিট কুড়ির মধ্যে পাঁচজন ভ্রমণকারী এক জায়গায় এলেন। ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, ডাক্তার ক্লবোনি এবং জনসন অবাক হয়ে দেখলেন বরফের ওপর পড়ে আছে টাটকা পায়ের ছাপ.।

—আমার অনুমান এগুলো এস্কিমোদের পায়ের ছাপ। বললেন হ্যাটেরাস।

—তাই হবে, বরফের ওপর এক জায়গায় আঙুল দেখিয়ে ডাক্তার বললেন, 'এই দেখুন, এগুলো বরফের ওপর পরবার বিশেষ ধরনের জুতো।'

—এই ছাপটা সম্বন্ধে আপনি কি বলেন ? একটা বিশেষ ছাপের দিকে আঙুল দেখিয়ে প্রশ্ন করে আল্টামণ্ট, পায়ের ছাপটা বার বার পড়েছে বরফের ওপর।

ডাক্তার দেখলেন। তাঁর মুখে কথা সরল না। ওটা যে ইউরোপে তৈরি কোন জুতোর ছাপ তাতে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না।

তাঁর, বা বলতে গেলে গোটা দলের বিস্ময়টা প্রকাশ করলেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস, 'এখানে ইউরোপের লোক এল কোত্থেকে ? চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।'

তারা সকলেই নিশ্চিত ছিল যে দীর্ঘ চার মাস দুরূহ এবং উত্তেজনা-পূর্ণ অভিযানের শেষে তারা এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছে যেখানে পৃথিবীর কোন লোক তার আগে কখনও আসে নি। আজ সকালে এখানে বরফের ওপর এই টাটকা পায়ের ছাপগুলো দেখে তারা প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত হয়ে পড়েছে।

ডাক্তার ফের পায়ের ছাপটা দেখতে লাগলেন। যত দেখলেন তত নিঃসন্দেহ হলেন তিনি। রবিনসন ক্রুশো প্রথম তাঁর দ্বীপে মানুষের পদচিহ্ন দেখে নিশ্চয় এমনই অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু হ্যাটেরাস প্রচণ্ড বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন। অভিযাত্রীদল পায়ের ছাপ অনুসরণ করে কিছুটা পথ এগুলো। ছাপগুলো চলে গেছে পশ্চিম দিকে। প্রায় আটমাইল পথ হাঁটার পর অভিযাত্রীদলের একজন প্রশ্ন করল, আর এগুনো তাদের উচিত হবে কি না।

—না, ক্যাপ্টেন বললেন, আমরা—

কিন্তু তিনি তাঁর নির্দেশ শেষ করতে পারলেন না। হঠাৎ ডাক্তারের অস্ফুট চীৎকার শুনে চুপ করে গেলেন তিনি। ডাক্তার মাটিতে কি

যেন কুড়িয়ে পেয়েছেন। তিনি পেয়েছেন পকেট টেলিস্কোপের একটা কাচ।

—আর কোন সন্দেহ রইল না যে আমরা ছাড়া এখানে অন্য মানুষের আগমন ঘটেছে। গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলেন তিনি।

—এগিয়ে চল, ক্যাপ্টেন নির্দেশ দিলেন।

আবার এগিয়ে চলল অভিযাত্রীর দল। দলের প্রায় সকলেই ক্লান্ত, কেউ কেউ বিরক্ত বোধ করছিল, হঠাৎ এখানে অন্য কোন মানুষের পদার্পণের আভাস পেয়ে।

—ভেঙে পড়লে চলবে না। ডাক্তার তাদের চাঙ্গা করার জন্য বললেন, সাহসে ভর করেই এগুতে হবে আমাদের।

—এত কাঠখড় পুড়িয়ে উত্তর মেরু পৌঁছে যদি দেখি আমাদের আগেই সেখানে গিয়ে বসে আছে অন্য এক দল, তবে গিয়ে কি লাভ, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল জনসন।

—হ্যাঁ, এটা যতই ভাবছি মনটা ততই মুষড়ে পড়ছে, ডাক্তার বললেন, ওগুলো যদি এস্কিমোর পায়ের ছাপ হতো তবে আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু যখনই ভাবছি একদল ইউরোপীয়ান আমাদের আগেভাগে এসে বসে আছে ওখানে তখনই আমার উৎসাহ অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে।

সেদিন আর নতুন কিছু ঘটল না। সন্ধে নাগাদ অভিযাত্রীদল একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানে তাঁবু ফেলল। উত্তর দিক থেকে প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইছে। আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। বাতাসের বেগ এত প্রবল যে অভিযাত্রীদলের আশঙ্কা হল যে তাঁবুটা উড়ে না যায়।

—রাতটা ভালয় ভালয় কাটলে বাঁচি, নৈশভোজ সমাধা করে বলে উঠল জনসন।

—তাঁবুটা যাতে উড়ে না যায় তার জন্যে বড় বড় পাথরের চাঁই দিয়ে ওটাকে চেপে রাখতে হবে, ডাক্তার বললেন।

—আপনি ঠিক বলেছেন ডাক্তার ক্লবোনি, বেল বলল, কেন না

তাঁবুটা যদি একবার উড়ে যায় তবে ওটা আর ধরা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

সাবধানে সবরকম ব্যবস্থা নিয়ে ক্লান্ত যাত্রীর দল ঘুমানোর উদ্যোগ করল। ক্লান্তিতে শরীর যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। কিন্তু ঘুমানো একেবারেই অসম্ভব। ঝড় যেন শিকল ছেঁড়া দৈত্যের মত দক্ষিণ থেকে উত্তরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ইঞ্জিনের মুখ দিয়ে যেমন বাষ্প নির্গত হয় তেমনি ভাবে মেঘগুলোকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে সারা আকাশময়। বরফের স্তূপ হুহুংকারে গড়িয়ে পড়ছে। ভয় হচ্ছে যে পৃথিবীর শেষ বুঝি আসন্ন।

—যে ভাবে পাথর ভাঙছে আমার অনুমান, আমরা সমুদ্রের কাছাকাছি রয়েছি। ডাক্তার বললেন।

—হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন ডাক্তারের কথার সায় দিয়ে বললেন, হয়ত আমরা তীরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি।

কাছেই কোথাও প্রচণ্ড শব্দে বরফ বিদীর্ণ হল। 'ওই শুনুন,' ডাক্তার সেই শব্দকে লক্ষ্য করে বললেন, 'শুনে মনে হয় না কি যে আমরা সমুদ্রের খুব কাছে?'

—তা যদি হয় তাহলে এই দুর্যোগের মধ্যে সমুদ্রে ভাসবার চেষ্টা না করে আমি বরং এই বরফের রাজ্যে থাকাটাই শ্রেয় মনে করব। বলে উঠলেন ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস।

—এই ঝড়ঝঞ্ঝার পর আর তার দরকার হবে না, মন্তব্য করলেন ডাক্তার। আজ রাতে যে সব অভিযাত্রীর দল বাইরে আছে তাদের কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে আমার।

ঝড় থামবার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তাঁবুর ভেতরে কারু চোখে ঘুমের দেখা নেই। ডাক্তার চাইছিলেন বাইরে গিয়ে সব কিছু দেখতে। কিন্তু এই বাতাসে তাঁবু থেকে এক পা বাইরে যাওয়া অসম্ভব। সুখের কথা, যে সকালের দিকে ঝঞ্ঝার তীব্রতা আস্তে আস্তে কমে এল। এখন বাইরে বেরিয়ে আসাটা অসম্ভব নয়। ডাক্তার, ক্যাপ্টেন এবং জনসন একটা তিনশো ফুট উঁচু ঢিপির ওপর উঠলেন। তাঁরা

দেখলেন এই টিপিটার কোথাও বরফের চিহ্নমাত্র নেই। হঠাৎ যেন গ্রীষ্মকাল এসে গিয়েছে। এই ঝড়ই শীতকে সরিয়ে পথ দেখিয়ে এনেছে তাকে। বরফকে যেন ধারালো খুর দিয়ে চেঁচে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হ্যাটেরাস তাকিয়ে আছেন উত্তরের দিকে।

—মনে হয় ওই বোধহয় সমুদ্র, দিগন্তের এক দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন ডাক্তার।

—হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে, বললেন হ্যাটেরাস, চলুন, আমরা তাড়াতাড়ি রওনা দিই।

—আপনার নিশ্চয় খুব আনন্দ হচ্ছে? ক্যাপ্টেনকে জিগ্যেস করলেন ডাক্তার।

—সে কথা বলতে, অল্পক্ষণের মধ্যেই উত্তর মেরু পৌঁছে যাব আমরা ভাবতেই রোমাঞ্চ জাগছে আমার সারা শরীরে, কী ডাক্তার, আপনিও নিশ্চয় খুব খুশী?

—হ্যাঁ, আমিও খুব খুশী, ডাক্তার বললেন কিছুটা অন্যমনস্কভাবে, আগের দিন দেখা সেই রহস্যময় পায়ের ছাপগুলোর কথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না।

ঠিক হল নৌকা তৈরি হবে শ্লেজ গাড়ির কাঠ দিয়ে। এ কাজের ভার দেওয়া হল জনসন আর বেলের ওপর। ডাক্তারের বিজ্ঞান এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে বিশেষ আগ্রহ। তিনি ব্যস্ত ছিলেন তাঁর হাইড্রো-গ্রাফীর মাপজোপ নিয়ে। জলের ওপর নৌকাটি ভাসানো পর্যন্ত ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ। তাঁর হিসেব মত এই জায়গাটি ৮৭ ডিগ্রী ল্যাটিচুড থেকে ১২৮ ডিগ্রী ল্যংইচুডের মধ্যে অবস্থিত। তার মানে উত্তর মেরু থেকে মাত্র তিন ডিগ্রী দূরে।

পরদিন সকালে জনসন আর বেল জিনিসপত্র গোছগাছ করে তৈরি। ডাক্তার কিন্তু যখনই যা করুন সেই পায়ের ছাপের কথা একবারও ভোলেন নি। তিনি ভাবছিলেন এই অদ্ভুত পায়ের ছাপ বিশিষ্ট এই আগন্তুকেরাও কি মেরুর অভিযাত্রী? যদি তাঁদের সঙ্গে এই দলটির দেখা হয়ে যায় তবে তার পরিণাম কি হবে? আশ্চর্য

যে এই দলটি মেরু প্রদেশে চলাফেরা করছে অথচ বরফের ওপর তাদের পদচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই তাদের চোখে পড়ল না। ডাক্তার ক্লবোনির গর্ব ছিল যে দুর্গম পৃথিবীর এই অংশে প্রথম পদচিহ্ন পড়বে তাঁদেরই। কিন্তু এখন তাঁদের এই গর্বের আরও একদল ভাগীদার আছে জেনে তিনি কিছুটা বিমর্ষ বোধ করলেন।

এসব ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার নতুন করে এই এলাকাটি পর্যবেক্ষণ করতে চাইছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। এই এলাকাটি ছেড়ে চলে যাবার আগে শেষবারের মত এই ভূখণ্ডটি দেখবার উদ্দেশে তিনি একশো ফুট উঁচু একটি টিপির ওপর উঠলেন। চুড়োয় উঠে পকেট থেকে টেলিস্কোপ বার করলেন ডাক্তার। টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে অবাক হলেন তিনি। এর ভেতর দিয়ে তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ডাক্তারের কখনও হয় নি। টেলিস্কোপটা ভাল করে পরীক্ষা করে তিনি বুঝতে পারলেন এর রহস্য। এর কাচটি কখন খুলে পড়ে গেছে। অমনি এমন এক চীৎকার ছাড়লেন ডাক্তার যে তাঁর সঙ্গীরা সচকিত হয়ে তাকাল তার দিকে। তাজ্জব হয়ে সবাই দেখল যে ডাক্তার নেমে আসছেন টিপিটার ওপর থেকে পড়ি কি মরি করে।

—কি হল ? ব্যাপার কি ? প্রশ্ন করল জনসন।

—সেই, সেই পায়ের ছাপ, ডাক্তার তখনও হাঁপাচ্ছেন।

—আবার নতুন কোন পায়ের ছাপ দেখলেন নাকি ? প্রশ্ন করলেন হ্যাটেরাস।

—না, না, ডাক্তার যন্ত্রটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, আমার টেলিস্কোপের কাঁচটা—

—আরে এর কাঁচটা কোথায় হারিয়ে বসলেন ? বলে উঠল আল্টামণ্ট।

—এটাই শুধু হারিয়ে ফেলিনি, আবিষ্কার করেছি এক নতুন তথ্যও, ডাক্তারের মুখে এখন হাসির ঝিলিক দেখা দেয়। ওই যে

পায়ের ছাপগুলো যা দেখে কাল সারারাত্তির আমরা কেউ ঘুমোতে পারিনি ওগুলো আসলে আমাদের পায়ের ছাপ, আর কারু না।

—এ্যাঁ, সে কি। এবার সব ক'জন অভিযাত্রী একসঙ্গে চীৎকার করে ওঠে, এ কি সত্যি !

—ষোলো আনা, আনন্দ এবং উত্তেজনা মিশে ডাক্তারের মুখটা তখন অদ্ভুত দেখাচ্ছে, কুয়াশায় পথ হারিয়ে আমরা একই জায়গায় ঘুরপাক খেয়েছি। নিজেদের পায়ের ছাপগুলো দেখে নিজেরাই ভেবেছি এখানে আবার কে এল ! টেলিস্কোপের যে কাঁচটা বরফের ওপর কুড়িয়ে পেয়ে আমাদের ভাবনার অন্ত ছিল না সেটা যে আমার টেলিস্কোপেরই কাঁচ সে রহস্য এখন পরিষ্কার।

—কিন্তু একটা ছাপ যে ছিল ইউরোপের তৈরি জুতোর, ক্যাপ্টেন হ্যাটেরাস প্রশ্ন করেন, সেটা সম্বন্ধে আপনার কি বলার আছে ?

—খুব পরিষ্কার। ওটা বেলের জুতোর ছাপ। আপনার মনে নেই বেল তার বরফের ওপর পরবার জুতোজোড়া ছিঁড়ে ফেলেছিল। তখন পরেছিল তার চামড়ার তৈরি সাবেক জুতোজোড়া—

বেল সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে সায় দিল এই কথায়। বাকি সকলে স্তম্ভিত হয়ে বসে ব্যাপারটা ভাবছে।

—কী বোকা আমরা, ডাক্তার মাথা নাড়েন, 'নিজেদের পায়ের ছাপ দেখেছি আর সেগুলো এস্কিমো না ইউরোপীয় কার জুতোর ছাপ ভেবে সারা হয়েছি। এ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল কিন্তু' কথা শেষ করে হেসে ওঠেন ডাক্তার।

বাকি সকলে সে হাসির প্রতিধ্বনি তোলে। এত দুঃখ আর কষ্টের মধ্যে এমন প্রাণখোলা হাসি কেবল মেরু অভিযাত্রীরাই বোধহয় হাসতে পারে।

জেনেভা হ্রদের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে জেনেভা নগরী। হ্রদ থেকে উৎপত্তি হয়েছে যে নদীর, তার নাম রোন। মাঝনদীতে ছোট একটা দ্বীপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে বলে নদী যেন আবার দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। আবার কখনও মনে হয় দ্বীপটা ওই নদীর মধ্যে ভেসে থাকা মস্ত এক মালবাহী নৌকা যেন।

নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে উঠছে একের পর এক বাড়ি। মনে হয় যেন এদের ভিত নদীর মধ্যেই। বাড়িগুলোর মস্ত থামগুলিকে জলের মধ্যে ডুবে থাকা অতিকায় প্রাণীর দাঁড়া বলে ভুল হয়; মনে হয় জল যেন এই থামগুলির জালে বাধা পেয়ে গভীর ক্ষোভে গর্জে গর্জে উঠছে।

এই দ্বীপেরই এই একটি জীর্ণ বাড়িতে থাকেন ঘড়ির কারিগর বুড়ো জাকারিয়ুস। বাড়িতে আর থাকার মধ্যে আছে তাঁর একমাত্র কন্যা জেরাদঁ, ছাত্র ওবেরতুন আর পুরনো দাসী স্কলাস্টিকা।

সবদিক থেকেই বুড়ো জাকারিয়ুস ছিলেন জেনেভার এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর বয়সের গাছ-পাথর ছিল না। শহরের সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দাটিও বলতে পারবে না বুড়ো কবে থেকে প্রথম এখানকার রাস্তায় চলাফেরা শুরু করেছে। সবাই শুধু এইটুকুই জানে যে যখন তিনি পথে বের হন তখন তাঁর লম্বা সাদা চুল হাওয়ায় ওড়ে। তাঁর পোশাক সব সময়েই গাঢ় রংয়ের—লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির ছবির মত যেন আপাদমস্তক কালো রংয়েই আঁকা তিনি।

ওই জীর্ণ বাড়িটির সবচেয়ে সুন্দর ঘরটিতে থাকে জেরাদঁ। ঘুলঘুলির মত ছোট এক টুকরো তার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় জুরা পর্বতের তুষার ঢাকা আশ্চর্য চূড়াটি। আর জাকারিয়ুসের শোবার ঘর আর কারখানা যেন জলের গায়ে লাগানো পাটাতনের

মত। ঘরের মেঝের নিচে জলের স্রোত ছলছল করে দিবারাত্র। একমাত্র খাওয়া ছাড়া সারাটা দিন বুড়ো কখনও তাঁর কারখানা-ঘর থেকে বেরোন না। কেউ বিশ্বাস করতে না চাইলেও একথাই সত্যি। তাঁর আর এক কাজ শহরের বড় বড় ঘড়িগুলোয় ঘুরে ঘুরে দম দেওয়া। প্রায় সর্বক্ষণ তিনি শুয়ে বসে থাকেন ছোট বড় ঘড়ি আর তার যন্ত্রপাতির মাঝখানে। আর শুনলে অবাক হতে হয় যে এই যন্ত্রপাতির বেশীর ভাগই মাস্টার জাকারিয়ুসের নিজের আবিষ্কার। এ কাজে তাঁর পটুতার কথা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও ছড়িয়েছে। ঘড়ির কারিগরীতে তিনি যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ এ সত্য আবিষ্কার করতে জেনেভার অন্য ঘড়িওয়ালাদের দেরি হয় নি। এই শহরের তিনি যে অন্যতম গর্ব তা স্বীকার করতেও দ্বিধা করে নি তারা। ঘড়ির মধ্যে সচলতার যে দিক অর্থাৎ সময়ের তালে তালে পা ফেলে চলা তা আবিষ্কার করেছেন ওই জাকারিয়ুস। আর তাঁর প্রতিভা যখন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর যন্ত্র আবিষ্কার করে তখনই সাধারণ লোক বুঝতে পারে ঘড়ির উপযোগিতা কি।

এইমাত্র তাঁর কারখানা ঘরে জাকারিয়ুস একনাগাড়ে অনেকক্ষণ কাজ করার পর এখন একটু বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছেন। আতসকাঁচ চোখে লাগিয়ে সূক্ষ্ম ও জটিল অংশগুলি সাজাচ্ছিলেন তিনি একের পর এক। তারপর মেঝের পাটাতনের তক্তা সরিয়ে ঝুঁকে দেখেন নিচে রোন নদীর প্রবল স্রোত আবর্ত তুলে ছুটে যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওইভাবে দাঁড়িয়ে সেই ভিজে ও ঘন বাষ্প বুকে টেনে নিয়ে যেন অদ্ভুত এক স্বস্তি পান তিনি।

সেটা ছিল এক শীতের রাত। যথারীতি টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে স্কলাস্টিকা। এ বাড়ির যেমন রীতি ওবের আর জেরাদঁ দুজনেই জাকারিয়ুসের সঙ্গে খেতে বসে। জাকারিয়ুসের খাবার অত্যন্ত সাবধানে রান্না করা হয়। কিন্তু সে রাতে খেতে বসে সবাইকে অবাক করলেন তিনি। সুন্দর নীল রেকাবিতে সাজানো খাবার স্পর্শও করলেন না তিনি। মেয়ে জেরাদঁের প্রশ্নের জবাব

কেবল হুঁ হুাঁ করে গেলেন কিংবা কোন কথাই বললেন না। জেরাদঁ অবাক হল বাবার এই নীরবতা লক্ষ্য করে। এমন কি যে স্কলাস্টিকার অনর্গল বকাবকানির সঙ্গে কেবল রোন নদীর অবিশ্রাম বয়ে যাওয়ারই তুলনা করা হয়, তারও বাচালতায় কান দিলেন না তিনি।

নৈশভোজের পর কাউকে শুভরাত্রি না জানিয়েই জাকারিয়ুস নিজের ঘরে প্রস্থান করলেন। এটাও একটা ব্যতিক্রম। প্রতিরাত্রে খাওয়ার পর কন্যাকে সস্নেহে চুম্বন করে যাওয়াই ছিল তাঁর নিয়ম। চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তাঁর ভারী পায়ের চাপে কাঠের সিঁড়িটাই শুধু কাতরানির আওয়াজ করল দু একবার।

জেরাদঁ, ওবের আর স্কলাস্টিকা তিনজনেই বসে রইল স্থাণুর মত। আজ সন্ধের পর থেকেই আকাশ মেঘলা। কেমন একটা বিষণ্ণতার ঘেরাটোপ চারিদিকে। ভিজে হাওয়া যেন বয়ে আনছে আসন্ন বৃষ্টির সংকেত। সুইজারল্যাণ্ডের প্রবল বর্ষাকাল যেন মন খারাপ করিয়ে দিতে চায় কেবল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দক্ষিণ দিকের বাতাস গজরাচ্ছে আর মনের মধ্যে ভিড় করছে যত আশঙ্কা।

'নীরবতা ভঙ্গ করল স্কলস্টিকাই। জেরাদঁকে উদ্দেশ করে বলল, 'কর্তাকে আজ কদিন ধরেই যেন কেমন মনমরা দেখাচ্ছে। এমন কি খাবারেও যে তাঁর কোন রুচি নেই তা তো দেখাই গেল। আমার মনে হয় হয়তো অনেক গোপন কথা জমিয়ে রেখেছেন উনি বুকের ভেতর। কিন্তু সেগুলি যে কি তা জানা বোধ করি শয়তানেরও সাধ্য নয়।'

—নিশ্চয় উনি উদ্বিগ্ন, গভীর দুঃখের সঙ্গে বলে জেরাদঁ, অথচ কারণটা যে কি তা তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না।

—মন খারাপ করবেন না মাদামোয়াজেল, জেরাদঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ওবের, 'মাস্টার জাকারিয়ুসের স্বভাব তো আপনার অজানা নয়। তাঁর মনের মধ্যে যে কি আছে তা উনি ছাড়া আর কে কবে জানতে পেরেছে! হয়ত আজ উনি বড় বেশী ক্লান্ত,

কাল হয়ত ওঁকে দেখবেন একেবারে অন্যরকম। তখন হয়ত আপনি কষ্ট পেয়েছেন জেনে উনি দুঃখ পাবেন খুব বেশী।'

ওবেরকে পছন্দ করেন জাকারিয়ুস। তাঁর ভাল লাগে তার সততা ও বুদ্ধি। নিজের হাতে তাই তাকে ঘড়ি তৈরির এমন সব কাজ শিখিয়েছিলেন যা শেখান নি আর কাউকে।

জেরাদেঁর রূপলাবণ্য দেখাবার মত। তার মুখের ছাঁদ গোল—ম্যাডোনার মত সরল আর স্বর্গীয় সুষমা তার সর্বাঙ্গে। দুটি চোখে অসীম সরলতা। তাই যে তাকে দেখে তাকে ভাল না বেসে থাকতে পারে না। তার পোশাক স্নিগ্ধ ও সুকুমার রংয়ের।

ধর্ম চর্চার প্রতিও ঝোঁক আছে এই সুরূপা কিশোরীর। সকালে ও রাতে লাতিন স্তোত্র পাঠ করে সে নিয়ম করে। সে জানে তরুণ ওবেরতুন তাকে পছন্দ করে খুব। বৃদ্ধ জাকারিয়ুসের এই বাড়িই যেন ওবেরের সারা জগৎ। সারাক্ষণ থাকে সে এই বাড়িতে। ঘড়িশালার কাজ শেষ হয়ে গেলে গল্প করে জেরাদেঁর সঙ্গে।

বুড়ি স্কলাস্টিকা সবই দেখে। সে জানে দিনকাল বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সারাদিন গেরস্থালীর কাজ করতে করতে অনর্গল বকবক করেই যায় সে। তাই ভয়ে নতুন কোন কথা তাকে জানাতো না কেউ। পাছে সে আরও বেশী বকতে শুরু করে। সে যেন এক দম-দেওয়া কলের গান, একবার চাবি ঘুরিয়ে চালু করে দিলে হাতুড়ির ঘা না মারা পর্যন্ত কেউ তাকে পারবে না থামাতে।

জেরাদেঁকে অমন বিষণ্ণ হয়ে বসে থাকতে দেখে স্কলাস্টিকা চেয়ার ছেড়ে উঠে এল পাথরের কুলুঙ্গীর কাছে। রুপোর পিলসুজে মস্ত একটা মোমবাতি জেলে মেরীমাতার মূর্তির পাশে দিল বসিয়ে। এই মূর্তির সামনে নতজানু হয়ে বসাই ছিল এ বাড়ির নিয়ম। সকলে এই প্রার্থনা করত যে রাত্রে সবাই যখন ঘুমে অচেতন তখন তিনি যেন সবাইকে দেখেন। আজ বাড়ির পরিবেশ এমনই বিষণ্ণ যে সে প্রার্থনা করার উৎসাহ জেরাদেঁরও নেই।

—একি! স্কলাস্টিকা বলল অবাক হয়ে, খাওয়া হয়ে গেছে এখন

মিথ্যে রাত জেগে কষ্ট পাওয়া কেন? ঘুমোলে অন্তত স্বপ্ন দেখেও কিছুটা আরাম পাওয়া যাবে। দিনকালের যা ছিরি হয়েছে তাতে সুখে থাকার যেন যো নেই আজকাল।

—বাবার জন্যে ডাক্তার ডাকা উচিত নয় কি আমাদের? জেরাদঁ শুধালো মৃদুস্বরে।

স্কলাস্টিকা প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'ডাক্তার বদ্যির কথা শুনেছেন কবে কর্তা। বরং ঘড়িকে দামী ওষুধ খাওয়াবেন কিন্তু নিজে কখনো না।'

—কী করব তাহলে? বিব্রত জেরাদঁ বলে ওঠে।

—জেরাদ, ওবের নম্র কণ্ঠে বলে, আপনার বাবা একটু ভাবনায় পড়েছেন এইমাত্র, আর কিছু তাঁর হয় নি।

—ওবের! আপনি কি জানেন কি সে ভাবনা? কি তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে এমন করে?

—ঠিক না জানলেও আন্দাজ করতে পারি।

—তাহলে বলে ফ্যালো দিকি চটপট। তাড়া দিয়ে বলে স্কলাস্টিকা।

—দিন কয়েক ধরে অদ্ভুত কতকগুলো ঘটনা ঘটছে, ওবেরতুন বলতে শুরু করে? আপনার বাবা গত কয়েক বছর ধরে যে সব ঘড়িগুলো বানিয়ে ছিলেন খদ্দেরদের ঘরে যাওয়ার পর সেগুলি একে একে সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মেরামতির জন্যে অচল ঘড়িগুলো ফেরত আসছে তাঁর কাছে। তিনি খুলে দেখছেন প্রায় কোন দোষ নেই সে সব ঘড়িতে। আবার সারিয়ে দিচ্ছেন তিনি ঠিকঠাক করে কিন্তু তারপরেও ঘড়িগুলো চলছে না।

—এ নিশ্চয় কোন শয়তানের কারসাজি। চেঁচিয়ে ওঠে স্কলাস্টিকা।

—কিন্তু আমার তো মনে হয় এটাই স্বাভাবিক, শান্ত কণ্ঠে বলে জেরাদঁ, জগতে অক্ষয় নয় কিছুই।

—তবু এটা ঠিক যে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, ওবের বল্লে; ঘড়িগুলো

কেন যে হঠাৎ বিকল হয়ে গেল তা তন্নতন্ন করে খুঁজেও বার করতে পারিনি আমি। অথচ এটা তো সত্যি সেগুলো বিগড়ে যাচ্ছে একের পর এক।

আমার তো মনে হয় ওই তামার কলগুলো, মানে তোমরা যাকে ঘড়ি বল, সেগুলোর ওই ভাবে চলা, ওই ভাবে ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড বলে দেওয়াটাই অস্বাভাবিক। এর চেয়ে আমাদের আমলের ওই ছায়া-ঘড়ি ঢের ভাল ছিল।

সে কথা কানে না নিয়ে জেরাদঁ ওবেরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমার কি মনে হয় বাবার ঘড়িগুলো যাতে ঠিকমত চলে তার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা উচিত আমাদের ?

—নিশ্চয়, জবাব দেয় ওবের।

খরচ কমানোর জন্যে হুম্ করে একটু আগে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নিভিয়ে দিয়েছিল স্কলাস্টিকা, এখন আবার প্রার্থনা করার জন্যে জ্বালানো হয় তা। তিনজনে নতজানু হয়ে বসে মেঝেতে। সবচেয়ে সুন্দর প্রার্থনার বাণী ও ভঙ্গী জেরাদেঁর। সে প্রথমে প্রার্থনা করে তার মায়ের আত্মার জন্যে, শেষে প্রার্থনা করে তার বাবার এই দুর্ভাগ্যের অবসান যাতে ঘটে সেই জন্যে।

প্রার্থনা শেষ করে উঠে দাঁড়ানোর পর তিনজনে তাদের হারানো বিশ্বাস অনেকটা ফিরে পায় যেন।

রাত যত বাড়তে থাকে তত বাড়ে শীতের রাতের আতঙ্ক ও বিভীষিকা। মাঝে মাঝে নদীর স্রোতের সঙ্গে আসে কন্‌কনে ঝোড়ো হাওয়া। ওবের চলে গেছে নিজের ঘরে। স্কলাস্টিকা তার বিছানায় শুয়ে স্বপ্ন দেখছে শয়তানের। একা জেরাদঁ বসে আছে জানলার ধারে। ওবেরের কাছে তার বাবার দুরবস্থার কথা শুনে তার মনে ভারী চিন্তা হয়েছে এই বৃদ্ধ মানুষটিকে নিয়ে। তার মনে ভয় যে, যে অবলম্বনের ওপর ভর করে এতটা বড় হয়েছে সে আজ তা দুর্বল হয়ে গিয়েছে বড় বেশী।

হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় ছাদের চিলেকোঠার জানলার পাল্লাটা

ভীষণ ভাবে ঘা মারে দেয়ালে। জেরাদঁ চমকে ওঠে। একটু পরে জানলার শার্সি খুলে ফেলে সে। জানলা দিয়ে ঝুঁকে খড়খড়িটা টেনে দিতে যাওয়ার ভয়ে ছম্‌ছম্ করে ওঠে তার সারা শরীর।

মনে হয় চারিদিকে যেন প্লাবন শুরু হয়ে গেছে। জীর্ণ বাড়িটা বুঝি ডুবে যাচ্ছে জলের তলায়। ভয় পেয়ে হয়ত জেরাদঁ তার ঘর ছেড়েই পালাত যদি না সেই মুহূর্তে আলোর রেশ দেখতে পেত জাকারিয়ুসের ঘর থেকে। হঠাৎ অস্ফুট এক বিলাপের ধ্বনি এসে কানে বাজে তার। জানলাটা বন্ধ করার চেষ্টা করে সে কিন্তু পারে না। ঝোড়ো হাওয়া যেন বারবার ঠেলে দিচ্ছে তাকে, লুকিয়ে বাড়িতে ঢোকবার সময় অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে যে ভাবে ঠেলে ফেলে দিতে চায় লোক।

জেরাদঁ খুব অস্থির বোধ করে। এত রাতে কি করছেন তার বাবা? কোনরকমে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ায় জেরাদঁ তার বাবার কারখানা ঘরের দরজার সামনে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বৃদ্ধ জাকারিয়ুস। ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ছে তাঁর সাদা চুল। জেরাদ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় চৌকাঠের কাছে। নিজের মনে কথা বলছেন মাস্টার জাকারিয়ুস।

'মৃত্যুই আমার ভবিতব্য এখন। আমার প্রাণই তো আমি টুকরো টুকরো করে বিলিয়ে দিয়েছি ওই ঘড়িগুলোর মাঝখানে। একটা একটা করে ওই অভিশপ্ত ঘড়িগুলো বন্ধ হয়ে যায় আর আমার মনে হয় আমার বুকের একটা অংশ যেন অচল হয়ে যায়। আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনই যে আমি ভরে দিয়েছি ওদের মধ্যে।'

অদ্ভুত এই কথাগুলি বলতে বলতে বৃদ্ধ বারবার বেঞ্চিতে ছড়ানো ঘড়ির কল-কব্জাগুলোর দিকে তাকাচ্ছেন। স্প্রিং জড়ানো একটা ফাঁপা নল তিনি তুলে নিলেন। লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে জাকারিয়ুস ওই নল থেকে স্প্রিংগুলো ছাড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। হঠাৎ এক তীক্ষ্ণ চীৎকার ছেড়ে স্প্রিংটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তিনি নদীর বুকে।

জেরাদঁ যেন পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। বাবার কাছে যেতে চাইল সে কিন্তু ভরসা পেল না যেন! হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে উঠল, 'জেরাদঁ, তুমি এখনও জেগে আছো? তোমার ঘরে চলে যাও লক্ষ্মীটি। শীতটা যে আজ বড় জাঁকিয়ে পড়েছে।'

—ওবের, ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল জেরাদঁ, বাবার নিশ্চয় কোন শক্ত অসুখ করেছে, ওবের। তাঁর ঘড়িগুলো অচল হয়ে পড়েছে বলে লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছে তাঁকে। ওবের, তুমি বল একথা কি সত্যি? নিশ্চয় ঘড়িগুলোর মধ্যে নিজের প্রাণ পুরে দেননি তিনি?

ওবের চুপ করে রইল।

—বাবার কাজ কি তবে ভগবানের চোখে দোষী? প্রশ্ন করে জেরাদঁ যেন ভয়ে কেঁপে ওঠে।

—জানি না জেরাদঁ, তার ঠাণ্ডা হাত ছুটি নিজের হাতে তুলে নিয়ে ওবের বলে, 'তুমি নিজের ঘরে যাও। একটু ঘুমোলে দেখবে মনের এই অস্থিরতা অনেকটা কেটে গেছে।'

আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরে আসে জেরাদঁ। ভোর না হওয়া পর্যন্ত বসে থাকে সে নিজের বিছানায়। আপ্রাণ চেষ্টায় দুচোখের পাতা এক করতে পারে না। আর ওদিকে নিজের ঘরে বসে মাস্টার জাকারিয়ুস দেখতে থাকেন কেমন করে তাঁর পায়ের তলায় রোন নদী অবিশ্রাম বেয়ে চলেছে দিগন্তের দিকে।

দুই

ব্যবসায়ে সৎ বলে জেনেভার ব্যবসায়ীদের নামডাক ছিল অনেক দিনের। নিজেদের মর্যাদা সম্পর্কে তারা ছিল অত্যন্ত সচেতন। তাই তাঁদের বিক্রি করা ঘড়িগুলি যখন খদ্দেরদের কাছ থেকে ফি র আসতে লাগল তখন মাস্টার জাকারিয়ুস যে কী পরিমাণ লজ্জায় পড়লেন তা অনুমান করা কঠিন নয়।

ঘড়িগুলো যে অকারণে আচমকা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। ঘড়ির ভেতরের চাকা বা কাঁটা ঠিক আছে, অকেজো হয়ে যাচ্ছে স্প্রিংগুলি। এতে একেবারেই ভেঙে পড়লেন জাকারিয়ুস। তাঁর সুনিপুণ কার্যকুশলতার জন্যে অনেকেই তাঁকে তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী, কালো জাদুবিদ্যার উপাসক বলে সন্দেহ করে এসেছে। এখন সেই সন্দেহ আরও জোরদার হবে। এই গুজব একসময় জেরাদেঁর কানে পৌঁছয়। বাবার পরিণামের কথা ভেবে শিউরে ওঠে সে। সন্দেহজনক ব্যক্তিরা ইতিমধ্যেই কুটিল চোখে তাকাতে শুরু করেছে বৃদ্ধ জাকারিয়ুসের দিকে।

পরিস্থিতি এমন প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও সকালে উঠে জাকারিয়ুস কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন। রাতের সেই অবসন্ন ভাব কিছুটা ঝেড়ে ফেলতে পেরেছেন তিনি। ওবেরতুন যখন কারখানায় ঢুকল তখন বৃদ্ধের শিষ্ট কণ্ঠের 'সুপ্রভাত' শুনে মুগ্ধ হল সে-ও।

—আজ আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি ওবের, বললেন মাস্টার জাকারিয়ুস, 'আজ এইরকম মানসিকতার মধ্যে তোমাকে একটা কথা বলে রাখি। তুমি একজন ভাল কারিগর সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি তো কাজ করবার সময় ভাবো যে তোমার হাতে রয়েছে সোনা, রুপো বা তামার কয়েকটা টুকরো। তুমি তো একথা কল্পনাও করতে পার না যে ওই ধাতুগুলো আমার মনীষা ও মেধার কাছ থেকে প্রাণ পেয়ে রক্তমাংসের জীবের মত স্পন্দিত হয়ে ওঠে। তোমার সঙ্গে তফাৎ আমার এইখানে। তোমার বানানো ঘড়ি বিকল হয়ে গেলে তুমি মরে যাবে না, কিন্তু আমার তাতে মহা সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

বলতে বলতে কেলাস কেটে তৈরি করা কতকগুলি সূক্ষ্ম কলকব্জা তুলে দেখালেন জাকারিয়ুস। কঠিন পাথরকে ঘষে মেজে শুধু হীরের মতই করে তোলেন নি দক্ষ কারিগর, তা দিয়ে তৈরি করেছেন অতি সূক্ষ্ম কলকব্জা সব।

—এই স্বচ্ছ আধারের ভেতর ঘড়িটা ধুকপুক করছে, এটা ভাবলে

আশ্চর্য লাগে না? ছাত্রের দিকে তাকিয়ে পরম আগ্রহের সঙ্গে শুধোলেন জাকারিয়ুস।

—হ্যাঁ, এ আপনার এক অপূর্ব সৃষ্টি। মুগ্ধ ওবের বলে ওঠে, বছরে এক সেকেণ্ডও এদিক ওদিক হবে না এর সময়ে—এ আমি বাজি ধরে বলতে পারি।

—সে বাজিতে নিশ্চয়ই জিতবে, জাকারিয়ুস বলেন প্রগাঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে, কেন না আমার মধ্যে যা কিছু শুদ্ধ ও নিষ্পাপ সব আমি ভরে দিয়েছি এর ভেতর। আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকপুকুনির মতই এ সদা সক্রিয় হয়ে কাজ করে যাবে। ওবের, হঠাৎ আবেগে থরথর কেঁপে ওঠে বৃদ্ধের গলা, আমাকে কি তোমরা পাগল ভাবো? কিন্তু দেখবে, একদিন আমি প্রমাণ করে দেব যে আমি কোন ভুল করিনি। সেদিন তুমি আমাকে সত্যি সত্যি বুঝতে পারবে। সেদিন দেখবে যে আমি আমার অস্তিত্বের মূল রহস্য বের করে ফেলেছি। সেদিন দেখবে প্রাণ কাকে বলে তা আমার জানা। শুধু তাই নয়, কোন জটিল রহস্যের মধ্যে দেহ ও আত্মার অভেদ মিলন রচনা হয়ে যায় তা-ও আমার জানা।

বলতে বলতে এক অলৌকিক দীপ্তি জ্বলে ওঠে তাঁর চোখে। তাঁকে দেখায় রাজার মত গর্বিত। যে দম্ভকে ক্ষমা করা যায়, মনে হয় জাকারিয়ুসের দম্ভও সেই জাতের।

তা সত্যি। জাকারিয়ুসের জীবন কালে ঘড়ি নির্মাণ শিল্প প্রভূত উন্নতি করেছে। খৃষ্টপূর্ব চার শতকে প্লেটো যে রাতের ঘড়ি নির্মাণ করেছিলেন, তারপর এই শিল্পের আর বিশেষ উন্নতি হয় নি। ওস্তাদ কারিগরেরা তখন ঘড়ি সঠিক সময় দেওয়ার চেয়ে কে কত সুন্দর ঘড়ি বানাতে পারে সেই দিকে নজর দিতেন বেশী। লোহা, তামা বা রুপোর মত নানা ধাতু দিয়ে শুরু হয়েছিল ঘড়ি নির্মাণের প্রতিযোগিতা। আধার ও আবরণের দিকেই তখন নজর ছিল বেশী, তাই ঘড়িগুলো যেন চোখ-ভুলানো খেলনায় রূপান্তরিত হচ্ছিল দিনে দিনে।

ঘড়ির নির্দেশে তখন নিয়ন্ত্রিত হত না মানুষের জীবন। মানুষের আয়ু তখন এত দীর্ঘ ছিল না কিন্তু তবু তারা জীবনকে উপভোগ করত অনেক বেশী। মানুষের অবসর ছিল বেশী আর কাজের জন্যে নির্দিষ্ট সময় কম। একটি মঠ বা গির্জা বানাতে সময় লাগত দুশো বছর ; একজন শিল্পী সারাজীবনে কেবলমাত্র কয়েকটি ছবি আঁকতেন। একটিমাত্র মহাকাব্য লিখেই শেষ হত কবির জীবন। কিন্তু তবু ভাবীকালের কাছে সেই অতীত রয়ে গেল রহস্য ও মাধুর্যে ভরা।

তারপর শুরু হয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি। তখন শুরু হল বিজ্ঞানের সাহায্যে সময়ের সূক্ষ্ম ও চুলচেরা মাপজোপের দিন। আর সেই যুগেই জন্মালেন জাকারিয়ুস। আবিষ্কার করলেন এমন এক ঘড়ি যা দেয় নির্ভুল সময়। দম্ভে ও গর্বে ভরে উঠল জাকারিয়ুসের বুক। এতেই ঘটল তাঁর সর্বনাশ। সময়কে শাসনে বাঁধতে পেরে তাঁর মনে হল তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছেন দেহ ও আত্মার মিলনের মূল রহস্যটি।

সেই দম্ভেরই প্রকাশ ঘটল তাঁর ওবেরকে বলা এই কথায়, 'তুমি যদি বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার কর তাহলে ভগবানের আর আমার কাজের মধ্যে অবশ্যই মিল খুঁজে পাবে। কেন না, তাঁর সৃষ্ট প্রাণীদের দেখেই ঘড়ির চাকা বানানোর কৌশল শিখেছি আমি।'

গুরুর কথার রেশ ধরেই ওবের বলে ওঠে, 'ভগবানের নিশ্বাসকেই তো আত্মা বলি আমরা—হাওয়া যেমন ফুলকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায়, তাঁর নিশ্বাসও তেমনি ভাবে প্রাণ সঞ্চার করে আমাদের মধ্যে। এর সঙ্গে কি না আপনি জড় কতকগুলো ধাতু—লোহা আর তামার কলকব্জার তুলনা করছেন? কোন যন্ত্র কি মানুষের প্রাণের চেয়ে নির্ভুল ও মহত্তর হতে পারে?'

—প্রশ্ন সেটা নয়, জাকারিয়ুসের গলার স্বরে ফুটে উঠল চাপা জেদ, একদিন আমি বুঝেছিলুম যে ঘড়ির মধ্যে যে গতি বন্দী হয়ে রয়েছে তা ঠিক যথেষ্ট নয়। সমতা রাখার জন্যে কোন চাকা যদি থাকে তবেই সে গতিকে সঠিক ছন্দে কাজে লাগাতে পারবে। একদিন আমার যা

স্বপ্ন ছিল তা সফল হল, আমি গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলুম। তুমি কি মনে কর না এ সাফল্য মহৎ এবং ঐশ্বরিক। একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো ওবের। তুমি নিশ্চয় বুঝবে যে আমাদের মধ্যে দুটি শক্তি কাজ করছে, দেহের এবং আত্মার। গতি আর নিয়ন্ত্রণ। কাজেই দেহই এই আত্মাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেহ আর মনের মিলনের মধ্যেই আছে এক মিলনের রহস্য। একটি চাকা ঘুরে গেলেই চলতে পারে আর একটি চাকা। এটাই আমার আবিষ্কার। প্রাণ যে আসলে একটি নিখুঁত কল তা আমি জানতে পেরেছি।

মতিচ্ছন্ন হয়েছে যার তেমন মানুষের মতই যে জাকারিয়ুস এই কথা বললেন তাতে সন্দেহ নেই। তবু ওবের কোন কথা বলতে পারল না। মেয়ে জেরাদঁ কিন্তু দাঁড়িয়েছিল চৌকাঠের কাছে। ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার বুকে।

—কি হল মা-মণি আমার ? শুধোলেন জাকারিয়ুস।

—এখানে যদি একটা স্প্রিং থাকত, বুকে হাত চেপে বলল আদুরে মেয়ে, তবে কি তোমায় এতখানি ভালবাসতে পারতুম বাবা ?

জেরাদঁকে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে হঠাৎ বুকে হাত চেপে আর্তনাদ করে উঠলেন জাকারিয়ুস। মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন তাঁর পুরনো চেয়ারের ওপর।

—কি হল বাবা ? কি হল তোমার ? চীৎকার করে উঠল জেরাদঁ।

ওবের চেঁচিয়ে ডাকল স্কলাস্টিকাকে। বুড়ি ঝি'টি কিন্তু ডাকামাত্র এল না। সদর দরজায় কে যেন কড়া নাড়ছিল। তখন সে গিয়েছিল দরজা খুলে দেখতে। সে যখন ঘরে ফিরল তখন বৃদ্ধ জাকারিয়ুস চোখ মেলে তাকিয়েছেন। সে কিছু বলার আগেই জাকারিয়ুস বলে উঠলেন, 'নিশ্চয় তুমি আর একটা নষ্ট ঘড়ি নিয়ে এসেছ স্কলাস্টিকা। আমার তৈরি আরও একটি ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ হয়ে গেছে—তাই না ?'

—কী আশ্চর্য ! আপনি কি করে জানলেন ? ওবেরের হাতে একটি বিকল ঘড়ি তুলে দিয়ে বলল স্কলাস্টিকা।

—যখনই আমার হৃৎপিণ্ড বারেকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, তখনই বুঝতে পেরেছি আরও একটি ঘড়ি, আরও একটি···

বৃদ্ধের এই করুণ বিলাপ শুনতে শুনতেই ওবের তার হাতের ঘড়িতে চাবি ঘুরিয়ে দম দেয়। কিন্তু বিকল সে ঘড়ি চলতে চায় না কিছুতে।

তিন

বৃদ্ধ জাকারিয়ুস ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছেন। যতই তিনি কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে চাইছেন ততই বুঝতে পারছেন তিনি কত দুর্বল। এর ওপর কিছু ঈর্ষাপরায়ণ লোক তাঁর নামে এমন সব কথা রটনা করতে লাগল যাতে তাঁর মনোকষ্ট বাড়ল আরও বেশী।

তাঁর তৈরি ঘড়িগুলি হঠাৎ একযোগে বিকল হয়ে যাচ্ছে এই খবর জেনেভার ঘড়ি কারিগরদের মধ্যে এক প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। ঘড়ির চাকাগুলো যে ভাবে অচল হয়ে পড়ছে তাতে সত্যি ঘড়িগুলোর সঙ্গে বৃদ্ধের প্রাণের কোন সংযোগ আছে কিনা তা নিয়ে ভাবতে বসল তারা। রহস্য এমনই যে এ সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলেই সর্বাঙ্গ শিরশির করে ওঠে। শহরের নানা শ্রেণীর লোক এই আলোচনায় মুখর হয়ে উঠল। অনেকেই এ ঘটনায় সচকিত হয়ে মাস্টার জাকারিয়ুসকে চাক্ষুষ দেখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু তাদের সে ইচ্ছে পূরণ হল না। বৃদ্ধ জাকারিয়ুস ভীষণ রকম অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

এই অসুখকে কোন চিকিৎসক সারিয়ে তুলতেও ব্যর্থ হলেন। কেউ এ অসুখের কোন কারণও খুঁজে পেলেন না। চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন যে মাঝে মাঝে তাঁর হৃৎপিণ্ড যেন আর ধুকপুক করে না আর তারপরই মনে হয় হঠাৎ তা ভয়ংকর বেগে চলতে শুরু করে দিয়েছে।

সারা দেশ জুড়ে জাকারিয়ুসের ঘড়ির নাম আর কদর। অনেক প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধের তৈরি ঘড়ির রাশ জনসমক্ষে দেখিয়ে গর্ববোধ করত। জাকারিয়ুসের এই বিপন্ন, বিধ্বস্ত অবস্থা তাদের ভীষণ রকম নিরুৎসাহ করে তুলল। একসময় এই বৃদ্ধ সাফল্যের কোন উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল তা তারা ভোলে নি। তারা মনে রেখেছে সেই চমৎকার ঘড়িগুলি যা সাধারণ মানুষের মনে গভীর সম্ভ্রম ও ভালবাসার উদ্রেক করত। বিদেশে ফ্রান্স, আলেমান ভূখণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড সর্বত্র চড়া দামে বিকোত এই সব ঘড়ি। এ সব তারা কেমন করে ভোলে!

জেরাদঁ আর ওবেরের সেবায় জাকারিয়ুস তাঁর হারানো শক্তি আস্তে আস্তে ফিরে পেলেন। তাঁর মনের বিক্ষুব্ধ অবস্থাও এখন অনেকটা শান্ত। যেদিন মনে হল যে হাঁটাচলা করার শক্তি পেয়েছেন অমনি জেরাদঁ তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে এল। বাড়িটা তো এখন সব সময় অতৃপ্ত উত্তেজিত ক্রেতাদের ভিড়ে ভরে থাকে। ওবের অবশ্য প্রতিদিন কারখানায় বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে বিকল ঘড়িগুলোর দোষ ধরার চেষ্টা করে। নানারকম যন্ত্রপাতি নেড়ে-চেড়ে খুলে পরিয়ে দেখে সেগুলো টিকটিক করে কি না। কিন্তু বেচারির সব চেষ্টাই বৃথা হয়। তখন ক্ষোভে দুঃখে দিশেহারা সে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে, তখন তাকে দেখে মনে হয় সে-ও বুঝি জাকারিয়ুসের মত মানসিক বিকৃতির শিকার।

জেরাদঁ তার বাবাকে নিয়ে শহরের সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন অঞ্চলগুলি দিয়ে ঘুরে আসে। হাত ধরে নিয়ে যায় সাঁৎ আঁতোয়ানের মঠের পাশ দিয়ে, অনেক দূরে কোলন পাহাড় পর্যন্ত। আঙুল দিয়ে বাবাকে দেখায় বুয়েৎ পাহাড়ের চুড়ো। এসব ঠাঁই, এমন কি নাম পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন জাকারিয়ুস। তাঁর স্মৃতির ওপর একে একে পর্দা সরে যায় এবং আনন্দ উৎসাহ ভরা ছেলেবেলাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পান তিনি। মেয়ের কাঁধে ভর দিয়ে তিনি তাকান দিগন্তের দিকে যেখানে আকাশ মিশেছে মাটিতে। সূর্যের আলো একই সঙ্গে এসে পড়ে

একজনের সোনালি চুলের গুচ্ছে আর একজনের রুক্ষ, ধূসর এলো-মেলো চুল-ভর্তি মাথার ওপর।

অবশেষে ধীরে ধীরে বৃদ্ধ জাকারিয়ুসের মনে এই উপলব্ধি জন্মালো যে এই পৃথিবীতে তিনি একা নন, এই বোধকে ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বুঝলেন যে তিনি চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে তার আদরের দুলালী কত অসহায় হয়ে পড়বে। তিনি জানেন যে তরুণ ওবেরতুন তাঁর মেয়েকে ভালবাসে এবং জেরাদঁও অনুরক্ত তার প্রতি। বৃদ্ধ বুঝলেন যে এরা একজন আর একজনকে গভীর ভাবে চায় এবং স্কলাস্টিকাকে একদিন তিনি তাঁর এইসব ভাবনার একটু আভাস দিলেন।

বুড়ি স্কলাস্টিকা তো একথা শুনে আহ্লাদে আটখানা। সাধুসন্তদের নামে দিব্যি করে সে বলল যে পনেরো মিনিটের মধ্যে সমস্ত জেনেভার এ খবর জেনে যাওয়া উচিত। তাকে শান্ত করতে গিয়ে বেশ বেগ পেতে হল জাকারিয়ুসকে; কিন্তু অনেক চেষ্টার পর জাকারিয়ুস এই কথা আদায় করলেন যে কিছুতেই সে এই খবর রটিয়ে বেড়াবে না। কিন্তু যে রকম বাচাল স্বভাবের মেয়ে সে, তাতে এই প্রতিশ্রুতি সে রেখেছিল বলে মনে হয় না।

এর ফলে হল কি, জেরাদঁ আর ওবের তাদের বিয়ের ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গ জানতে না পারলেও গোটা জেনেভা এই আলোচনায় মত্ত হল। কিন্তু লোকে যখন জটলা পাকিয়ে এই নিয়ে খুব গালগল্প করে তখন নাকি ভিড়ের মধ্যে অদ্ভুত এক ধরনের চাপা হাসি শোনা যায় আর কে নাকি ফিস্‌ফিস্ করে বলে ওঠে, জেরাদঁ ওবেরকে কোনদিনই বিয়ে করবে না।

এই অদ্ভুত কথাটা বলে এক বুড়ো। অদ্ভুত তার আকৃতি। তার মাথাটা চ্যাপ্টা মত আর কাঁধটা এত চওড়া যে সেটা সারা দেহের দৈর্ঘ্যের সমান মনে হয়। তার মুখ ঘড়ির ডায়ালের মত আর···

এই কদাকার আকৃতি জীবটি হালে শহরে এসেছে। কিন্তু একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে যে সূর্য যখন ঠিক মধ্যরেখা পেরিয়ে যায় তখন সাঁৎ পিয়েরের গির্জের কাছে গিয়ে সে থেমে পড়ে, তারপর

ঠিক বেলা বারোটার ঘণ্টা বাজলে আবার চলতে শুরু করে। শহরের যেখানেই জাকারিয়ুসকে নিয়ে কোন আলোচনা হচ্ছে সেখানেই সে হাজির আছে। এটাও চোখে পড়ে যে জাকারিয়ুস যখন তাঁর মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে বের হন তখন এই অদ্ভুত ব্যক্তিটি একদৃষ্টে এই বৃদ্ধ ঘড়ি কারিগরের দিকে তাকিয়ে থাকে।

জেরাদঁ একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করল তাকে। তার মনে হল, এ অপদেবতা বই আর কেউ নয়। ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরল সে তার বাপকে।

—কী হল তোর? সস্নেহে জিগ্যেস করলেন জাকারিয়ুস মেয়েকে।

—জানো বাবা, ওই যে ওই লোকটা, সবসময় ও আমাদের পেছন পেছন ঘোরে।

পেছন ফিরে বামনের মত দেখতে লোকটাকে বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করলেন জাকারিয়ুস।

—বাঃ, নির্ভুল সময় দিচ্ছে দেখি, খুশি খুশি গলায় বলে ওঠেন জাকারিয়ুস, 'কাঁটায় কাঁটায় চারটে বাজে। জেরাদঁ, ভয় পাসনে, আসলে ও একটা ঘড়ি।'

বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে গেছে জেরাদঁ। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা সময় ঠাহর করলেন কি করে!

—ওবের কোথায় রে? জাকারিয়ুস একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। ওকে দেখছি না কদিন ধরে।

—ও কারখানা ঘরে আছে বাবা।

—ও ঘড়িগুলি সারাচ্ছে বসে বসে, তাই না? কিন্তু ও তো ওগুলো সারাতে পারবে না। সাধারণ মেরামতে তো ওগুলো ঠিক হবে না। নতুন জীবন দিতে হবে ওদের। শয়তান নিজে এসে ওদের মধ্যে মহামারীর বীজ ছড়িয়ে দিয়ে সবগুলো অচল করে দিয়ে গেছে যেন।

গম্ভীর হয়ে গেলেন জাকারিয়ুস এই কথা বলে। বাড়ি ফিরে এসে একটিও কথা বললেন না। সোজা চলে গেলেন তাঁর কারখানায়।

অসুখ থেকে উঠে এই প্রথম সেখানে পা দিলেন তিনি। বিষণ্ণ মনে জেরার্দ চলে গেল তার নিজের ঘরে।

যে মুহূর্তে জাকারিয়ুস তাঁর কারখানা ঘরের চৌকাঠে পা দিয়েছেন অমনি একটা ঘড়িতে ঢং ঢং করে পাঁচটা বেজে উঠল। ঘড়িগুলো সবই ঠিকভাবে চলত এতকাল, আর গর্বে উল্লাসে বুক ভরে উঠত জাকারিয়ুসের। কিন্তু আজ একসঙ্গে না বেজে পরপর বাজলো ঘড়িগুলো একটার পর একটা। ফলে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে একটানা ঘণ্টার শব্দ জাকারিয়ুসকে বধির করে দিতে চাইল যেন। বিষম কষ্টে ছটফট করে উঠলেন জাকারিয়ুস। একটার পর একটা ঘড়ির কাছে গিয়ে হাত নাড়তে লাগলেন তিনি—কিন্তু নির্দেশ অমান্য করে বাদ্যযন্ত্রগুলো বেজে উঠলে সঙ্গীত পরিচালকের যে দশা হয় বৃদ্ধ কারিগরের অবস্থাও হল সেই রকম। আর যেন এদের ওপর তাঁর কোন কর্তৃত্ব নেই।

শেষ ঘণ্টার রেশ মিলিয়ে যাবার আগেই ঘরের দরজা খুলে গেল হুম করে। সামনে দাঁড়িয়ে সেই খর্বাকৃতি বামন। তাকে দেখেই জাকারিয়ুসের সারা শরীর যেন শিউরে উঠল। একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে লোকটি বলে ওঠে, 'মাস্টার জাকারিয়ুস, আপনার সঙ্গে দু একটা কথা বলতে পারি ?'

—কে তুমি ? প্রশ্ন করেন জাকারিয়ুস।

—আপনারই সহযোগী একজন। সূর্যের গতিবিধি শাসন করাই আমার কাজ।

—তাই নাকি ! জাকারিয়ুস খানিক উত্তেজিত হন, তাহলে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তোমার কাজটা তুমি মোটেই ভালভাবে কর না। তোমার সূর্যের তো চলার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। তার সঙ্গে মানিয়ে চলতে গিয়ে আমাদের ঘড়ির সময় কখনও এগুতে কখনও পেছুতে হয়।

—হক কথা বলেছেন আপনি, অদ্ভুত দর্শন লোকটি বলে ওঠে। 'আপনার ঘড়ি যেমন নিখুঁত নিয়মে চলে সূর্য সব সময় তা চলে না। তবে একদিন সবাই বুঝতে পারবে যে পৃথিবীর আবর্তনের জন্যে এমন

হয় এবং তখন একটি মধ্যক আবিষ্কার করে লোকে এই অনিয়মের মধ্যে সমতা রক্ষার চেষ্টা করবে।

—কিন্তু ততদিন পর্যন্ত কি আমি বেঁচে থাকব ?

—কেন বেঁচে থাকবেন না, আগন্তুক এবার হেসে ওঠে, তারপর এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ে একটি চেয়ারে। এবার বিদ্রূপের ভঙ্গীতে সে জাকারিয়ুসকে বলে, 'কিন্তু কি ব্যাপার বলুন দিকি ? জেনেভার তাবৎ লোক বলছে আপনার স্বাস্থ্য নাকি ক্রমেই ভেঙে পড়ছে ? আপনার শরীরের ঘড়ি সারিয়ে তোলার জন্যে ডাক্তার-বদ্যি ডাকা নাকি জরুরী হয়ে পড়েছে ?'

সে প্রশ্নের সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে জাকারিয়ুস বললেন, 'এইসব ঘড়িগুলির সচলতা আর আমার প্রাণের মধ্যে কোন যোগ আছে বলে মনে হয় কি তোমার ?'

—নিশ্চয় ! আমার তো মনে হয় ঘড়িগুলির দোষের কোন শেষ নেই। চরম বিশৃঙ্খলা ওরাই ডেকে আনছে। এবং এর জন্যে উপযুক্ত শাস্তিও তাদের পাওয়া উচিত। এটা তাদের অন্যায়। তাই তারা যখন বিকল হয়ে পড়ছে আপনার মত সেরা কারিগরও হাজার চেষ্টা করে সারিয়ে তুলতে পারছে না তাদের।

—সেটা তো হঠাৎ আমার অসুখ করেছিল বলেই, বলতে বলতে জাকারিয়ুসের সারা শরীরে ঘাম ছড়িয়ে গেল, তাই তাদেরও অসুখ করল তখন।

—তাহলে জানেন তো কি হবে। আপনার প্রাণের সঙ্গে তাদের সচলতার যোগ আছে বললেন তো ? তাহলে যেহেতু এই ঘড়িগুলোর স্প্রিংয়ের এতটুকু স্থিতিস্থাপকতা আনতে পারছেন না, সেজন্যে আপনাকেও মরতে হবে তাদের সঙ্গে।

—না, এটা হতে পারে না। তারা কোনদিন মরবে না। কারণ তুমি তো নিজেই বললে আমি কোনদিন মরব না। আমি, মাস্টার জাকারিয়ুস, পৃথিবীর পয়লা নম্বর ঘড়ি-নির্মাতা। আমার অবদান কি কম বলতে চাও তুমি ? আমি সময়কে শাসন করেছি,

বন্দী করেছি মহাকালকে, আমি মরতে পারি না। আমি এই ভ্রাম্যমাণ মুহূর্তগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেছি। আমার যদি মৃত্যু ঘটে তবে আবার সেই অসীমে ফিরে যেতে হবে মানুষকে, বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠেন মাস্টার জাকারিয়ুস। তাঁর ভঙ্গী দেখে মনে হয় তিনি যেন স্বষ্টিকর্তার সামনে দাঁড়িয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন, 'ঈশ্বর যদি অসীম অর্থাৎ সময়কে সৃষ্টি করে থাকেন আমি সৃষ্টি করেছি সীমা। আমি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর সমান। আমি মাস্টার জাকারিয়ুস, ঈশ্বরের হাত থেকে কেড়ে নিয়েছি তাঁর ক্ষমতা।'

—ঠিক বলেছেন হুজুর, তাঁর কথায় সায় দিয়ে বলে উঠল কদাকার সেই বামন, আপনার কীর্তি সত্যিই অমর। ঈশ্বরের সঙ্গে যদি কারু এমন নিখুঁত তুলনা করা যায় তবে সে আপনি। আর সেই জন্যেই তো এই অবাধ্য ঘড়িগুলোকে কি করে শাসন করবেন, এই দাস আপনাকে সে উপায় বলে দিতে এসেছে।

—কী সেই উপায়? চেঁচিয়ে বলে উঠলেন জাকারিয়ুস। বলো আমায়, এখুনি বলো।

—আপনার মেয়ের সঙ্গে যদি আমার বিয়ে দেন তবেই জানতে পারবেন সে উপায় কি।

—কী? আমার মেয়ে? জেরাদেঁর সঙ্গে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—কী অসম্ভব কথা! জেরাদঁ তো আর একজনকে ভালবাসে।

—বেশ, তাই যদি হয়, তবে ওবের আর আপনার কন্যার চিরসুখ প্রার্থনা করুন গিয়ে, কিন্তু মনে রাখবেন আপনার ঘড়িগুলি আর কোনদিন চলবে না। কোনদিনও না। আর জেরাদেঁর সঙ্গে ওবেরের বিয়েও হবে না কোনদিন।

এই কথা বলে সে-ই বামন চলে গেল। আর সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জাকারিয়ুস শুনলেন তাঁর বুকের মধ্যে বাজছে ঢং ঢং করে ছটা বাজার ঘণ্টা।

চার

দিন দিন মাস্টার জাকারিয়ুস অবসন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন দেহে মনে। তবু প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে কাজে বসতেন তিনি প্রতিদিন। কে যেন তাঁকে বাধ্য করে কাজ করার জন্যে। মেয়ে জেরাদঁ কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারে না তাঁকে কাজে বসা থেকে।

সেই কিম্ভূতদর্শন বামনটির সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে জাকারিয়ুস যেন দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন আরও বেশী। যেন স্থির করেছেন তাঁর অসাধারণ প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে ঘোচাবেন তিনি সব অপবাদ। জেনেভার ঘড়িগুলি সব খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে তিনি সেগুলো মেরামত করালেন। তবু ঘড়িগুলি যে কেন বিকল হয়ে পড়েছিল তার কারণ কিছুতেই আবিষ্কার করা গেল না।

জাকারিয়ুস যখন শহরের ঘড়িগুলি মেরামত করতে বেরোতেন তখন তাঁর মেয়ে আর ওবের প্রায়ই বেরোত তার সঙ্গে। জাকারিয়ুস এতে খুশীই হতেন। তখনও তিনি বিশ্বাস করেন যে নিজের প্রাণকেই তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন এই ঘড়িগুলোর মধ্যে। নিজের-ক্ষতবিক্ষত আঙুল ওবেরকে দেখিয়ে উত্তেজিতভাবে তিনি বলেন, এই দেখো, নিজেকে কত যন্ত্রণা দিয়ে কত ছোট ছোট তামার পাত নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কি দশা হয়েছে আমার।

এদিকে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রুষ্ট ক্রেতার দল তাঁর বাড়িতে এসে হানা দেয়। তারা তাদের বিকল ঘড়ির সমস্যা কোরাসে তুলে ধরে বিব্রত জাকারিয়ুসের সামনে।

—আমার ঘড়িটা কেবলই পেছিয়ে পড়ছে, অভিযোগ করে কেউ, কিছুতেই ঠিক সময় দেয় না।

কেউ বা বলে তার ঘড়ির কাঁটা এমনই একগুঁয়ে যে একচুল নড়ে না—জোশুয়ার সূর্যের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেবল।

আবার অনেকে বলে বেশ মজার কথা। 'আপনার ঘড়িগুলিতে শুনেছি নাকি আপনার স্বাস্থ্যের প্রভাব পড়ে। সেক্ষেত্রে আপনাকে অনুরোধ করব আমরা ঝটপট সুস্থ হয়ে ওঠার জন্যে।'

'জাকারিয়ুস শূন্য দৃষ্টিতে তাকান তাদের দিকে। একটু পরে বলেন, একটু অপেক্ষা করুন। বসন্তকাল আসুক। তখন হয়ত সূর্যের উষ্ণ উত্তাপে সজীব হয়ে উঠবে এরা।'

—বাঃ বেশ বলেছেন, ক্ষুব্ধ ক্রেতার দল বলে ওঠে একজোটে, 'সারা শীতকাল যদি রোগে ভোগে ঘড়িগুলো তাহলেই তো হয়েছে। ঘড়ির ঢাকনির ওপর নিজের নাম সই করা আছে সে কথা কি ভুলে গেলেন মশাই? নিজের মহিমান্বিত স্বাক্ষরের মর্যাদা একটু রাখবার চেষ্টা করুন মাস্টার জাকারিয়ুস।'

শেষকালে এমন হল যে লোকের তিরস্কার আর সহ্য করতে না পেরে জাকারিয়ুস ঠিক করলেন যে ক্রেতাদের ঘড়ি চেয়ে নিয়ে তাদের মূল্য ফিরিয়ে দেবেন। এ খবর পেয়ে ক্রেতারা সব দল বেঁধে আসতে লাগলো তাঁর বাড়ি, আর জলের মত বেরিয়ে যেতে লাগল তাঁর সব অর্থ। জেরাদঁ খুব খুশী হল তার বাবা এভাবে নিজের সম্মান রক্ষা করতে চাইছেন। ক্রমে ক্রমে জাকারিয়ুসের সব সঞ্চয় নিঃশেষ হতে লাগল, শেষে এমন হল যে ওবেরও তার যথাসর্বস্ব সঁপে দিতে চাইল গুরুদেবের হাতে।

এ হেন দুঃসময়ের মধ্যেও জাকারিয়ুসের মনে হয় ভবিষ্যতের কথা, দুশ্চিন্তা হয় তাঁর মেয়ের কথা ভেবে।

ওবের মুখ ফুটে কিছুতেই বলতে পারে না যে জেরাদঁকে সে ভালবাসে। জানাতে পারে না যে ভবিষ্যতের ওপর তার গভীর আস্থা আছে। যদি সে সাহস করে এ কথা বলতে পারত তবে মাস্টার জাকারিয়ুস হয়ত সেই দণ্ডে তাঁকে জামাতা রূপে গ্রহণ করে সেই অলক্ষুণে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ করে দিতে পারতেন। বামনের সেই অতি ভয়ংকর দুর্বাক্য, 'জেরাদেঁর সঙ্গে ওবেরের বিয়ে কোনদিনই হবে না' এখনও তাঁর কানে অবিরত গুঞ্জন করে ফেরে।

এদিকে একের পর এক বিকল ঘড়ি কিনতে কিনতে জাকারিয়ুস যেন দেউলে হতে বসেছেন। স্বর্ণমুদ্রার পুঁজি ফুরোতে এখন মহার্ঘ সব বাসন-কোসন, বাড়ির দেয়ালে কারুকাজ করা সুন্দর প্যানেল, প্রাচীন ফ্লেমিশ শিল্পীদের তৈরি ছবিগুলিতে হাত পড়েছে। জেরাদেঁর চোখে তাদের সেই বাড়ি এখন অনেক নিরাবরণ ঠেকে। এমন কি তাঁর কাজের জন্য যে সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতেন ক্রুদ্ধ ক্রেতাদের তুষ্ট করার জন্যে সে সবও বেচে দিতে হল মাস্টার জাকারিয়ুসকে।

মাস্টার জাকারিয়ুস যে ইদানীং ধর্মকর্মে অত্যন্ত অবহেলা করতেন এটা সকলেই লক্ষ্য করত। এককালে মেয়েকে নিয়ে তিনি নিয়মিত গির্জেয় যেতেন—প্রত্যেক ভাবপ্রবণ মানুষের মত তিনিও ঈশ্বরের উদ্দেশে উচ্চারিত স্তব ও স্তোত্রের আবেদনে সাড়া দিতেন। অথচ এখন আর তাঁকে গির্জের ধারে কাছে দেখা যায় না। তাঁর এই হঠাৎ ধর্মচর্চার প্রতি অনিচ্ছা তাঁর অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্বকে আরও একটু রহস্যময় করে তুলল। তাঁর এই ভাবে প্রার্থনাসভায় যোগদানে অবহেলাকে লোকে ব্যাখ্যা করল অন্যভাবে। তিনি কালো জাদুবিদ্যার চর্চা করেন এবং ডাকিনী তন্ত্রের উপাসক—লোকের এই সন্দেহটি এর দ্বারা আরও দৃঢ় হয়ে উঠল। পিতা যাতে ঈশ্বর এবং পৃথিবীর কাছে দিয়ে আসেন এই উদ্দেশ্যে জেরাদঁ এবার ধর্মের সাহায্য নেবে স্থির করল। কিন্তু ইতিমধ্যে জাকারিয়ুসের অন্তরে শুরু হল এক প্রবল দ্বন্দ্ব —এক দিকে বিজ্ঞান, ধর্ম অন্যদিকে। বিজ্ঞানের অহংকারের সঙ্গে শুরু হল মানুষের ধর্মবিশ্বাসের।

জাকারিয়ুসের মনে অবশ্য তখন বিজ্ঞানের ওপর আর কিছু নেই। জেরাদঁ তার বাবাকে এই পথ থেকে ফেরাতে চাইল। এবং তার নিরন্তর চেষ্টার ফল কিছু ফলল। যখন বৃদ্ধ কথা দিলেন যে পরের রবিবার গির্জার প্রার্থনা সভায় যোগ দেবেন তিনি, শুনে মেয়ের মন ভরে গেল আনন্দে। বুড়ি স্কলাস্টিকারও ভারী ফুর্তি! এতদিন তার মনিব সম্বন্ধে যে সব গুজব ছড়ানো হচ্ছিল তার যোগ্য উত্তর দিতে পারবে সে। যারা তার প্রভুকে কালো জাদুকরীর উপাসক ও ম্লেচ্ছ

বলে উপহাস করে তাদের মুখের মত জবাব দিতে পারবে সে। পাড়া-পড়শীদের এই খবরটি জানানোর জন্যে সেই দণ্ডে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

—সত্যি নাকি। পড়শীরা বলল অবাক মেনে, এতদিনে তাহলে সুমতি হল তোমার প্রভুর। আমরা তো জানতুম তিনি যা কিছু করেন সব শয়তানের সঙ্গে পরামর্শ করেই।

—তাহলে তোমরা নিশ্চয় শোন নি তার তৈরি ঘড়ির ঘণ্টাগুলি যে এতকাল ঢং ঢং করে এসেছে, পাল্টা যুক্তি দেখায় বুড়ি, সে তো কেবল প্রার্থনার সময় ঘোষণা করার জন্যেই।

—মানলাম, কিন্তু তিনি তো এমন যন্ত্র আবিষ্কার করেন নি যা আপনা থেকেই চলে—ঠিক মানুষের মত কাজ করে যায়?

—বাঃ কি যে বল, সেই যে আশ্চর্য একটা লোহার ঘড়ি বানিয়েছিলেন, টাকা ছিল না বলে জেনেভার লোক যা কিনতে পারে নি। আদেঁরনাতের বাগানবাড়িতে যেটা এখন আছে, রেগে ফুঁসে বলে স্কলাস্টিকা, কোন শয়তানের সাধ্য ছিল কি তেমনি ঘড়ি বানায়? সে ঘড়ির ডায়াল থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় একটি করে নীতিবাক্য বেরিয়ে আসে—ওই নীতিগুলি পালন করলে যে কোন খ্রীষ্টান নিশ্চিত স্বর্গে পৌঁছে যাবে। তা একে কি কোন শয়তানের কাজ বলে?

সত্যি দু' দশক আগে তৈরি আদেঁরনাতের বাগানবাড়ির ওই লোহার ঘড়িটি জাকারিয়ুসের জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। এটা যখন বানিয়েছিলেন তখন তিনি খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে। এমন একটা পরমাশ্চর্য ঘড়ি বানানোর পরও কিনা লোকে তাঁকে ডাকিনীর শিষ্য বলে। তবে এখন আবার তিনি গির্জেয় যাতায়াত আরম্ভ করলে তাঁর সম্বন্ধে এই সব অপপ্রচার চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু মেয়েকে যে কথা দিয়েছিলেন জাকারিয়ুস তা কিন্তু একেবারে ভুলে গেলেন। সকালবেলা গির্জেয় না গিয়ে চলে গেলেন তিনি তাঁর কারখানা ঘরে। বিকল ঘড়িগুলিকে আবার সচল করে তোলার ক্ষমতা যে তাঁর নেই, এটা উপলব্ধি করে তিনি উদ্যোগী হলেন

নতুন ঘড়ি বানাতে। এখন সেই কেলাস-ঘড়িটা শেষ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন তিনি। কিন্তু এমনই তাঁর কপাল যে সব সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ও চুনী, হীরের মত দামী পাথর বসানোর পর যেই তিনি সেটা দম দেবার চেষ্টা করলেন অমনি ঘড়িটা তাঁর হাত থেকে গেল পড়ে।

জেরাদঁ অবশ্য এ ঘটনা জানতে পারল না। জাকারিয়ুসই জানালেন না তাকে এর বিন্দুবিসর্গ। কিন্তু এরপর থেকে তাঁর স্বাস্থ্য দ্রুত ভাঙতে আরম্ভ করল। ঘড়ির যে দোলক স্বাভাবিক বেগ হারিয়ে ফেলছে এবং ক্রমশ মন্থর গতিতে আন্দোলিত হচ্ছে তাঁর অবস্থা এখন হল সেইরকম। কোন এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণী ক্ষমতা যেন তাঁর ওপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে তাঁর সমাপ্তির দিকে।

জেরাদঁ যে রবিবারের জন্যে দিন গুনছিল অবশেষে তা এল। সেদিন আবহাওয়া ভারী চমৎকার, শহরের লোকেরা দলে দলে পথে বেরিয়েছে। আবার বসন্ত ফিরে এল—খুশি হয়ে এই কথা বলাবলি করছে তারা। বাপের হাত ধরে গির্জের পথে চলেছে জেরাদঁ খুশি মনে, পেছনে স্কলাস্টিকা। পথের দুধারে দাঁড়িয়ে লোক দেখছে কৌতূহল-ভরে। ঠিক যেন কোন শিশুকে হাত ধরে হাঁটতে শেখানো হচ্ছে, না শিশুকে হাঁটতে শেখানো নয়, যেন অন্ধকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে জেরাদঁ। জাকারিয়ুসকে গির্জে ভেতরে পা দিতে দেখেই সাঁৎ পিয়েরের অনুচরেরা শিউরে উঠল এক অজানা ভয়ে।

সারা গির্জে তখন মুখর ঈশ্বরের বন্দনা গানে। জেরাদঁ বসেছে তার নির্দিষ্ট আসনে নতজানু হয়ে। বৃদ্ধ জাকারিয়ুস কিন্তু নত হলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন মেয়ের পাশে দৃপ্ত এবং ঋজু ভঙ্গীতে। শুধু ভঙ্গীতেই স্পর্ধা নয় অন্তরেও তাঁর শ্রদ্ধার লেশমাত্র ছিল না। সমবেত কণ্ঠে যখন স্তবগান গাওয়া হল তখন তাতেও যোগ দিলেন না তিনি। অহংকারী ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে দেখাচ্ছিল পাথরের মূর্তির মত, নিশ্চল এবং স্তব্ধ। অথচ সে যুগ ছিল বিশ্বাসের যুগ, ঈশ্বরের মহিমার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হবার সেই পরিবেশেও তিনি দুর্বিনীতের

মত ব্যবহার করলেন। বাবার দিকে তাকাতেই জেরাদেঁর দুচোখ জলে ভরে এল। ঠিক সেই সময় সাঁৎ-পিয়ের গির্জের মস্ত ঘড়িটায় বেজে উঠল ঘণ্টা। বৃদ্ধ তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকালেন সেই ঘড়িটার দিকে। তাঁর মনে হল ওই প্রাচীন ঘড়িটাও যেন পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। ঘড়ির গায়ে আঁকা প্রতিটি সংখ্যা যেন আগুন দিয়ে লেখা। ঘড়ির দুটি কাঁটা থেকে যেন ছড়িয়ে পড়তে চাইছে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ।

স্তবগীতি শেষ হতে এখন সকলে বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে। পুরোহিতরা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন কতক্ষণে বারোটার ঘণ্টা পড়ে। আর কয়েক মুহূর্ত পরেই সেই ঐশী কুমারীর চরণে শেষ প্রণতি জানিয়ে বিদায় নেবেন তাঁরা।

হঠাৎ একটা কর্কশ চীৎকারে গির্জের সেই পবিত্র পরিবেশ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আচমকা প্রচণ্ড যন্ত্রণায় তীব্র চীৎকার করে উঠেছেন মাস্টার জাকারিয়ুস।

ঠিক তখন দেখা গেল ঘড়ির কাঁটাটা যেন বারোটার ঘরে গিয়ে থমকে থেমে গেছে। আর কোনদিন এই ঘড়িতে বারোটা বাজবে না।

বাপের দিকে ছুটে গেল জেরাদঁ। কাটা গাছের মত পড়ে আছেন জাকারিয়ুস। ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল বাইরে।

বাড়িতে নিয়ে আসা হল তাঁকে ধরাধরি করে। অচেতন মানুষের মত পড়ে আছেন তিনি। যন্ত্রণায় অবশ হয়ে গেছেন যেন।

যখন জ্ঞান ফিরল দেখলেন জেরাদঁ আর ওবের সাগ্রহে তাকিয়ে তাঁর মুখের দিকে। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর বুঝতে অসুবিধে হল না যে তাঁর বিহনে একাকিনী মেয়েটির কি অবস্থা হবে।

—আমার মেয়েকে আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম, ওবেরকে ডেকে বললেন বৃদ্ধ। তারপর হাত বাড়িয়ে দিলেন তাদের দিকে। মনে হল যেন তাঁর শেষ শয্যাতেই তিনি আশীর্বাদ করে যাবেন দুজনকে।

কিন্তু পরক্ষণেই যেন সে ঘোর কেটে গেল। মনে পড়ে গেল

বামনের আকৃতির সেই আগন্তুকের কথা যে বারবার বলত ওবেরের সঙ্গে জেরাদেঁর কখনও বিয়ে হবে না। অমনি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন যেন।

—আমি মরতে চাই না, প্রচণ্ডভাবে চীৎকার করে বলে উঠলেন জাকারিয়ুস, আমি মাস্টার জাকারিয়ুস। আমার মরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। আমার খাতা, কই? হিসেবের খাতা?

সঙ্গে সঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন নিজেই। বার করলেন খুঁজে তাঁর হিসেবের খাতা। এই খাতায় লেখা থাকে সব ক্রেতার নাম ও ঠিকানা। দ্রুত হাতে পাতা উল্টে গেলেন সে খাতার। থামলেন গিয়ে একটা পাতায়।

—এই যে! পেয়েছি, চেঁচিয়ে উঠলেন আবার বীভৎসভাবে জাকারিয়ুস, 'এই সেই ঘড়ির খদ্দের। পিত্তনোচ্চিয়োকে যে ঘড়ি আমি বিক্রি করেছিলুম এখনও সেটা ফেরত আসে নি। তার মানে সেটা যথারীতি চলছে। সেটা বিফল হয় নি এখনও। ওই ঘড়ির মধ্যেই রয়েছে আমার প্রাণ। যে করে হোক এই ঘড়িটাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাকে। আর সেটা পেয়ে এত যত্ন করে রেখে দেব যে মৃত্যু আমার ধারে ঘেঁষতে পারবে না।'

বলতে বলতে আবার জ্ঞান হারালেন তিনি। ওবের আর জেরাদঁ এই বিদ্রোহী বৃদ্ধের জন্যে নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করতে লাগল ঈশ্বরের কাছে।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। একদিন তিনি উঠে দাঁড়ালেন, মনে হল তাঁর এই আরোগ্যের পেছনে আছে অতিপ্রাকৃত কোন শক্তি। আবার কাজে হাত দিয়েছেন জাকারিয়ুস, যেন অমানুষিক কোন উৎস থেকে শক্তি পেয়েছেন তিনি। যেন তাঁর অহংকারই তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তবু জেরাদঁ আর মিথ্যে আশ্বাসে ভোলালো না নিজেকে। তার পিতার দেহ ও মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া চিরকালের মত কোন দুঃস্বপ্নের মধ্যে হারিয়ে গেছে যে তাতে তার কোন সন্দেহ রইল না।

এখন তাঁর মনে নিজের পোষ্যদের সম্বন্ধে এতটুকু ভাবনা নেই। সঞ্চয়ের শেষ কপর্দক পর্যন্ত উড়িয়ে দেওয়ার জন্যে তিনি ব্যগ্র। অফুরন্ত এক প্রাণশক্তিতে এখন টলমল করছেন। নিজের মনে বিড়বিড় করে কি যে বলে চলেন তা স্পষ্ট বোঝাও যায় না।

একদিন সকালে তাঁর কারখানা ঘরে গিয়ে জেরাদঁ তাঁকে খুঁজে পেল না। গোটা বাড়িটায় আর কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। কি হল, কোথায় গেলেন তিনি, বাপের জন্যে বড় উতলা বোধ করল জেরাদঁ। সারাদিন তাঁর জন্যে পথ চেয়ে বসে রইল কিন্তু তিনি ফিরলেন না।

সমস্ত শহর তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওবের যখন তাঁর দেখা পেল না তখন অনুমান করা গেল যে শহর ছেড়েই চলে গিয়েছেন তিনি। জেরাদঁকে বলল সে তার সন্দহের কথা।

শুনে কেঁদে ফেলল, জেরাদঁ।

কোথায় যেতে পারেন তিনি ভাবতে গিয়ে ওবেরের মনে পড়ল তার গুরুদেবের শেষ কথা। একটি পুরনো লোহার ঘড়ি এখনও পর্যন্ত ফেরত না আসার কথা বলতেন তিনি বারে বারে। কে জানে, হয়ত সেই ঘড়িটার সন্ধানেই বেরিয়ে পড়েছেন তিনি।

ওবের তার ভাবনার কথা তখুনি জানাল জেরাদঁকে।

—বাবার হিসেবের খাতাটা দেখলে আমরা সেই ক্রেতার নাম ঠিকানা জানতে পারি হয়ত, বলল জেরাদঁ।

তখুনি কারখানা-ঘরে ঢুকল তারা। হিসেবের খাতাটা খোলাই পড়েছিল একধারে। সেটা খুলে দেখা গেল ফেরত পাওয়া সব ঘড়িগুলো লাল কালি দিয়ে কেটে দিয়েছেন জাকারিয়ুস—বাকি রয়েছে কেবল একটি ঘড়ি। ঘন্টা আর সচল মূর্তি সমেত সে ঘড়ি বিক্রি করা হয়েছে আঁদেরনাতের বাগানবাড়ির মালিক মঁসিয় পিত্তানোচ্চিয়োর কাছে।

এই হল সেই আদর্শ ঘড়ি, স্কলাস্টিকা যার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত।

—নিশ্চয় বাবা ওইখানে গিয়েছেন, বলল জেরাদঁ।

—চল, আমরাও সেখানে যাই, প্রস্তাব করল ওবের। হয়ত এখনও গেলে প্রাণে.বাঁচানো যাবে তাঁকে। আর দেরী নয়, চলো—

শুরু হল তাদের যাত্রা। জেনেভা শহর থেকে দেনৎস দু-মিদির গিরিসংকট পেরোতে কুড়ি ঘণ্টা লাগল, তার আগে পেরিয়ে এসেছে ওরা লেমান হ্রদ। অনেক কষ্ট সহ্য করে পেরুলো দ্রঁজ-এর পাহাড়ী নদী—আর যেখানেই গেল খোঁজ নিল তারা জাকারিয়ুসের এবং স্থানীয় লোকের সঙ্গে কথা বলে বুঝল যে ঠিক পথেই চলেছে তারা।

পরের দিন ভোরে এভিয়াঁরে এসে পৌঁছল তারা। আর অল্প-দূরেই সুইজারল্যাণ্ড। ওবের কখনও জেরাদঁকে, কখনও স্কলাস্টিকাকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে যাতে এই দীর্ঘ ও দুর্গম ভ্রমণের ক্লান্তিতে ভেঙে না পড়ে তারা। তারপর তারা এসে পৌঁছল ব্যুভের-এর রোন নদী আর জেনেভা হ্রদ যেখানে মিশেছে সেইখানে।

এবার হ্রদের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে যাত্রা শুরু হল তাদের। ধীরে ধীরে পথশ্রমে কাবু হয়ে পড়তে লাগল তারা। এক এক করে পেরিয়ে এল তারা ফিরোনাৎস, শেস আর কলম্বে নামে পাহাড়ী গ্রামগুলি। শক্ত গ্রানাইট পাথরের ওপর চলার ফলে ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল তাদের পা। তবু এতটা পথ এসেও মাস্টার জাকারিয়ুসের কোন খোঁজ পেল না তারা।

তবু তাঁর খোঁজ পেতেই হবে। তাই বিশ্রাম করার কথা না ভেবে এগিয়েই চলল তারা। অবশেষে ক্লান্তি ও অবসাদে অর্ধমৃত অবস্থায় পৌঁছল তারা নতরদাম-দু-সেক্সের মধ্যে। জায়গাটি রোন নদীর ঠিক ছ'শো ফুট ওপরে।

তখন ক্লান্তিতে তিনজনেই অবশ। সেখানকার যাজকের শরণা-পন্ন হতে তিনি পথিকদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সহৃদয় যাজক কিন্তু জাকারিয়ুস সম্বন্ধে কোন খবরই দিতে পারলেন না ওদের। শুনে দুশ্চিন্তায় ভরে গেল তিনজনের বুক। এই বন্ধুর পাহাড়ী পথে কোথাও যদি তিনি পড়ে গিয়ে থাকেন তবে সে তো হবে তাঁর চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার সমান। বাইরে অন্ধকার ক্রমশ

গাঢ় হল আর বাতাস যেন ক্ষুধিত পশুর মত গর্জন করে ফিরতে লাগল পাহাড়ের গায়ে গায়ে। চুড়ো থেকে ধস্ নামল প্রচণ্ড শব্দ করে—এই আঁধার রাতে হঠাৎ যেন এই সুপ্ত পাহাড়টির নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে।

যাজকের ঘরের ভেতর আগুনের কুণ্ডের সামনে বসে ওবের আর জেরাদঁ বৃদ্ধ ঘড়ি-কারিগরের করুণ কাহিনীটি খুলে বলল তাঁকে। বাইরে তখন অবিরল ধারায় তুষার ঝরছে আর এক টুকরো বাঁকা চাঁদ দেখে মঠের কুকুরটি ডুকরে কেঁদে উঠছে—ঝোড়ো হাওয়ার বিলাপের সঙ্গে সে ডাক যেন মিশে যাচ্ছে অদ্ভুত ভাবে।

—দম্ভ, যাজক তাঁর অতিথিদের উদ্দেশ করে বললেন, 'দম্ভ একবার পতন ঘটিয়েছিল এক দেবতার। এই ভয়ংকর দেয়ালের গায়েই মানুষের অদৃষ্ট বারে বারে মাথা কোটে। কোন যুক্তির কথায় কর্ণপাত না করাই হল দম্ভের লক্ষণ। তোমার বাবার জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, জেরাদঁকে লক্ষ্য করে বললেন যাজক।

চারজনে যখন নতজানু হয়ে বসেছে প্রার্থনা করবে বলে এমন সময়ে বাইরে মঠের কুকুরটি হঠাৎ ডেকে উঠল দ্বিগুণ জোরে। কে যেন মঠের বন্ধ দরজায় এসে ধাক্কা দিচ্ছে সজোরে।

—খোলো, খোলো, দরজা খোলো।

হঠাৎ দরজা খুলে ছিন্ন জীর্ণ বসন পরা কে একজন এসে দাঁড়াল উদ্‌ভ্রান্তের মত।

—বাবা তুমি! জেরাদঁ ডাকল চেঁচিয়ে।

হ্যাঁ, মাস্টার জাকারিয়ুসই বটে।

—হ্যাঁ আমি, ভাঙা গলায় যেন আর্তনাদ করে উঠলেন মাস্টার জাকারিয়ুস, কোথায় আছি আমি জানো? সীমাহীন চিরন্তনতার মধ্যে। সময় থেমে গেছে, আর কোনদিন ঘণ্টা বাজবে না। সব কাঁটাগুলো খসে পড়েছে ঘড়ি থেকে।

—বাবা, মেয়ের এই করুণ ডাকই বোধ করি বারেকের জন্যে

বৃদ্ধকে ফিরিয়ে আনল মর্তলোকে। জেরাদঁ, তুমি এখানে ? ওবেরও এসেছো। ও, পুরানো গির্জেয় বিয়ে করতে এসেছ তোমরা দুজনে ?

বাবা, জেরাদঁ উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরে অনুনয় করল, ফিরে এসো। আমাদের সঙ্গে ফিরে চল জেনেভায়।

একটানে হাত ছিনিয়ে নিলেন জাকারিয়ুস। দ্রুত গতিতে গেলেন দরজার কাছে। বাইরে তখনও তুষার ঝরে পড়ছে অবিরল ধারায়।

—সন্তানদের ত্যাগ করে যাবেন না, মিনতি করে বলল ওবের।

—না, দূর থেকে মূর্তিমান বিষণ্ণতাই যেন কথা কয়ে উঠল। আমার জীবন যেখানে আর নেই, একটা অংশ চিরকালের জন্য অবলুপ্ত হয়ে গেছে সেখানে আর কিসের জন্য ফিরে আসা।

—কিন্তু আপনার আত্মা। সে তো অমর—

—হ্যাঁ, আমার মহিমার মতই সে অমর। কিন্তু সে এখন বন্দী হয়ে আছে আদেঁরনাতের প্রমোদ কুঞ্জে, আমি তাকে দেখতে চাই। মুখোমুখী হতে চাই তার—

একথা শুনে যাজক বুকে ক্রুশ আঁকলেন এবং ভাঙা গলায় বললেন, আঁদেরনাতের ওই কেল্লায় যে থাকে সে চিরকালের মত হারিয়ে গেছে। যে ক্রুশকে সম্মান করে না, সে অভিশপ্তের মুক্তির কোন আশা নেই।

জেরাদঁ করুণ মিনতি জানাল, বাবা, ওখানে যেও না। ওখানে যেও না তুমি—

—যেতেই হবে আমাকে। আমার আত্মা রয়েছে ওই ঘড়ির মধ্যে। তা আমাকে ফিরে পেতেই হবে।

—ধরো ওঁকে, জেরাদঁ চীৎকার করে বলে ওঠে, যেতে দিও না।

কিন্তু কে তাঁকে ধরবে। লাফিয়ে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে সকলের নাগালের বাইরে চলে গেছেন জাকারিয়ুস। শূন্য এবং অন্ধকার প্রান্তর ভেদ করে কেবল এক করুণ আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে, 'আত্মা, আমার আত্মা—'

তিনজন ছুটল তাঁর পিছু পিছু। দুর্গম, পিছল পথ, বড় কষ্টকর

সে পথে পা ফেলা, তবু সেই পথ ধরেই চলেছেন জাকারিয়ুস ঝড়ের বেগে। সমস্ত প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছেন জাকারিয়ুস তাঁর নিয়তির দিকে।

তারপর ধীরে ধীরে চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি প্রাচীন কেল্লার ধ্বংসস্তূপ। নিচে পাথরের টুকরো ছড়ানো আঁকাবাঁকা পথ চলে গেছে চুড়োর দিকে।

—ওই যে, ওই যে আমার আত্মা, খ্যাপার মত ছুটতে ছুটতে আর্তস্বরে ডেকে উঠলেন জাকারিয়ুস।

আদেঁরনাতের কেল্লাটি এখন ধ্বংসস্তূপ বই আর কিছু নয়। কেল্লার ওপরে একটি বিশাল স্তম্ভ উঠে গেছে ওপরের দিকে। এমন জীর্ণ দশা তার যে, যেকোন মুহূর্তে তা ভেঙে পড়তে পারে। প্রশস্ত কতকগুলি হলঘর তখনও দাঁড়িয়ে আছে সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে, আগে যেখানে খিলান তৈরি হয়েছিল পাথর কেটে এখন সেই গর্তের ভেতরে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে বিষধর সাপ। একটা অতি পুরনো, ঘুণধরা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন জাকারিয়ুস। তাঁর প্রবল করাঘাতে ভেঙে পড়ল দরজার পাল্লা, সঙ্গে সঙ্গে সে শব্দে সচকিত হয়ে মাথার ওপর পাখা ঝাপটে উড়তে লাগল বাদুড় আর চামচিকের দল।

ঘরটা বিরাট, আসলে একটা মস্ত হলঘর। অন্য ঘরগুলির চেয়ে কিছুটা পরিচ্ছন্ন। ভেতরে বিকটাকৃতি সব প্রেতমূর্তি, আরও নানা অপদেবতার ছবি। সমস্ত দেয়ালটা ঢেকে রেখেছে তারা। জানলার পাল্লাগুলি বাতাসের ধাক্কায় যেন শিউরে শিউরে উঠছে।

সেই হল ঘরটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে উল্লাসে যেন চীৎকার করে উঠলেন জাকারিয়ুস।

দেয়ালের গায়ে টাঙানো ওই যে ঘড়ি ওরই মধ্যে লুকিয়ে আছে তাঁর প্রাণ। প্রাচীন কোন রোমক মন্দিরের মত তার গঠন, ঘড়িটা ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে ঘণ্টাস্তম্ভের ওপর। এই ঘড়ি জাকারিয়ুসের অতুলনীয় কীর্তি। একদা খাঁটি খ্রীষ্টানের মত এক ঐশী প্রেরণায়

উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ মেনে তৈরি করেছিলেন এই ঘড়ি—যার নির্দেশ ও নীতি অনুযায়ী জীবন-যাপন করলে মানুষের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী।

উল্লাসে যেন অধীর হয়ে পড়েছেন মাস্টার জাকারিয়ুস। তাড়াতাড়ি ওই ঘড়িটা করায়ত্ত করার জন্যে যেই তিনি এগিয়ে গিয়েছেন ঠিক সেই সময় তাঁর কানের পাশে কে যেন অট্টহাসি করে উঠল।

ঘুরে দাঁড়ালেন জাকারিয়ুস সঙ্গে সঙ্গে। মোমবাতির আলোর পাশে আবিষ্কার করলেন জেনেভাতে দেখা সেই কদাকার বামনকে।

—তুমি? তুমি এখানে?

তার শয়তানের মত আকৃতি দেখে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে জেরাদঁ গা ঘেষে দাঁড়িয়ে আছে ওবেরের।

—আপনাকে স্বাগত জানাই মাস্টার জাকারিয়ুস, শয়তানের মত দেখতে বলে উঠল সেই ভয়ংকর লোকটি।

—কে তুমি?

—সেনর পিত্তানোচ্চিয়ো, আপনার একান্ত বশংবদ। আপনি নিশ্চয় আপনার কন্যাকে আমার হাতে তুলে দিতে এসেছেন? আপনার বোধহয় স্মরণ আছে আমি বলেছিলাম ওবেরের সঙ্গে ওর বিয়ে হবে না। কেমন স্মরণ আছে তো আপনার?

এ কথা শোনামাত্র পিত্তানোচ্চিয়োর দিকে সবেগে ছুটে গেল ওবের। কিন্তু চোখের পলকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল পিত্তানোচ্চিয়ো।

—বাবা, চল এখুনি এখান থেকে পালাই। মিনতি করে বলল জেরাদঁ।

কিন্তু মাস্টার জাকারিয়ুস আর সে ঘরে নেই। ওবেরকে থামতে বলে বারান্দা পেরিয়ে দুর্বল শরীর নিয়ে ছুটেছেন তিনি সেই শয়তানের পিছু পিছু। ওরা তিনজন সেই প্রেতপুরীর মত ফাঁকা হলঘরে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে। অন্ধকারের মধ্যে এক পা সামনে বাড়াতে সাহসে কুলোল না কারু।

রাত কাটল এক অমানুষিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। দিনের আলো ফুটতে তবে তাদের সাহস হল সামনের ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে যে অসংখ্য সিঁড়ির ধাপ সামনে উঠে গেছে তাতে পা দেওয়ার। দু ঘণ্টা ধরে ঘুরল তারা এই অন্তহীন সিঁড়ির আবর্তনে তবু কোন জীবিত মানুষের দেখা পেল না। শুধু দূর থেকে কোন প্রাণীর কাতর চীৎকার শোনা গেল মাঝে মাঝে। শেষকালে সেই সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিয়ে পৌঁছলো তারা আবার সেই মস্ত হলঘরে। । তবে ঘরটা এখন আর ফাঁকা নেই। মাস্টার জাকারিয়ুস আর পিত্তা-নোচ্চিয়ো কথা বলছেন সেখানে।

জেরাদঁকে দেখতে পেয়েই তার দিকে এগিয়ে গেলেন জাকা-রিয়ুস। তার হাত ধরে পিত্তানোচ্চিয়োর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন তিনি, জেরাদঁ, এঁর দিকে তাকিয়ে ভ্যাখো। ইনিই হবেন তোমার স্বামী।

শুনে সর্বাঙ্গ যেন শিউরে উঠল সেই কোমলাঙ্গী কিশোরীর।

—এ হতেই পারে না, চীৎকার করে প্রতিবাদ জানাল ওবের, আপনার মেয়ে আমার বাগদত্তা।

—কখ্খনো না, পিতার ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাল জেরাদঁও।

হোহো করে শয়তানের হাসি হেসে উঠল পিত্তানোচ্চিয়ো।

—তাহলে কি তুই কি চাস আমার মৃত্যু হোক, ভাঙা গলায় বলে উঠলেন বৃদ্ধ, 'ওই যে ঘড়িটা দেখছিস, ওরই মধ্যে ধুকপুক করছে আমার প্রাণ। যতগুলো ঘড়ি বানিয়েছিলুম আমি তার মধ্যে এই একটাই এখনও বিকল হয় নি। আর এই লোকটা কেবলই বলছে তোকে বিয়ে করতে দিলেই ও ঘড়িটা আমায় দিয়ে দেবে। সে-ই এখন এ ঘড়িটার মালিক, চাইলে এটা বন্ধ করে আমায় চিরতরে শেষ করে দিতে পারে।...জেরাদঁ, তুইও কি আমায় ত্যাগ করবি? তুইও কি আমায় আর ভালবাসিস না?'

—বাবা, জেরাদঁ যেন মূর্ছিতের মত কাতরোক্তি করে উঠল।

—তুই যদি একবার জানতিস কি ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে আমাকে। হয়তো ঘড়িটা পুরনো হয়ে এসেছে। হয়তো তার স্প্রিংগুলোয় মরচে ধরে যাচ্ছে···তবু একবার যদি ওটা হাতে পেতুম, তবে দিনরাত যত্ন নিয়ে অটুট রাখতে পারতুম ওটার প্রাণ। আমি জেনেভার শ্রেষ্ঠ ঘড়ি-কারিগর। আমার মৃত্যু তো সর্বনাশেরই আর এক নাম। জেরাদঁ, তুই তোর বাবাকে মারতে পারিস না। আমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এই লোকটাকে বিয়ে করতে হবে তোকে।

শুনে সন্ত্রস্ত স্কলাস্টিকা বুকে ক্রুশ আঁকল আর ঘরটা কাঁপিয়ে দিয়ে পিত্তানোচ্চিয়ো আবার হেসে উঠল অট্টহাসি।

—আমি তোর বাপ জেরাদঁ, আমার কাছ থেকে প্রাণ পেয়েছিস তুই, পাগলের মত অনুনয় করে উঠলেন জাকারিয়ুস, তোর বাবাকে তুই সে প্রাণ ফিরিয়ে দে।

—জেরাদঁ, ফিস্‌ফিস্ করে ওবের বলে উঠল, মনে রেখ জেরাদঁ, তুমি আমার বাগদত্তা।

—কিন্তু তিনি যে আমার বাবা, নিরুপায় আকুতি ফুটল জেরাদঁের গলায়, তাঁর কথা আমি ফেলি কি করে।···

—পিত্তানোচ্চিয়ো, মাস্টার জাকারিয়ুস বলে উঠলেন, 'জেরাদঁ তোমার। এবার তোমার কথা রাখো ভাই।'

—এই যে, সেই লোহার ঘড়ির লম্বা চাবিটা এগিয়ে দিয়ে বলল ভয়ঙ্কর পিত্তানোচ্চিয়ো। চাবিটা হাতে পাওয়া মাত্র জাকারিয়ুস দৌড়ে গেলেন ঘড়িটার কাছে। লোহার আংটা থেকে সেটা খুলে নিয়ে চাবি ঘুরিয়ে দম দিতে থাকলেন সেটায়। অবিশ্রান্তভাবে দম দিয়ে চলেছেন তিনি। অনেকক্ষণ একটানা দম দেওয়ার পর অবশেষে একসময় শ্রান্ত হয়ে থামলেন।

—বাস্, এ যা দম দিয়েছি, একশো বছর পর্যন্ত চালু থাকবে এই ঘড়ি, চেঁচিয়ে উঠলেন জাকারিয়ুস, আগামী এক শতাব্দী পর্যন্ত এ ঘড়ির চলায় কোন ব্যাঘাত ঘটবে না।

হল থেকে ছুটে বেরিয়ে এল ওবের। উন্মত্তের মত সেই কেল্লার

গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় বাইরে এসে খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিয়ে বাঁচল যেন। তাড়াতাড়ি ফিরে চলল সেই নতরদামের মধ্যে। তার পীড়াপিড়িতে সেই সহৃদয় যাজক শেষে রাজী হলেন আদেঁরনাতের কেল্লায় যেতে।

জেরাদঁ যে ওই শয়তানের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবে কোন প্রতিবাদ করে নি তার কারণ তার শরীর-মন ছিল সম্পূর্ণ বিকল। চোখে জল দেখা দেয় নি কেন না প্রচণ্ড আঘাতে অশ্রুর উৎস গিয়েছিল শুকিয়ে।

এখন দম দেওয়ার পর বৃদ্ধ জাকারিয়ুস দাঁড়িয়ে আছেন সেই ঘড়িটার সামনে, আর একবার ঘণ্টা বেজে উঠতেই স্কলাস্টিকা দেখছে ঘড়ির চকচকে ডায়ালে ফুটে উঠছে এই লিখন—

মানুষকে ঈশ্বরের সমান হতে হবে।

এই অনুশাসন যে অন্যায় তা জাকারিয়ুসকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করে নি। নেশাগ্রস্তের মত আরক্ত চোখে তিনি পড়েছেন সে বাণী। দম্ভে তাঁর বুক গেছে ভরে।

এগারোটার ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অনুশাসন ফুটে উঠল ঘড়ির বুকে। জাকারিয়ুস পড়লেন, 'মানুষকে ক্রীতদাস হতে হবে বিজ্ঞানের। স্বজন-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজনকে উৎসর্গ করতে হবে তার কাছে।

—হ্যাঁ, এটাই ঠিক, জাকারিয়ুস সায় দিয়েছেন সে বাণী পাঠ করে, 'জগতে বিজ্ঞানই সবার ওপরে। তার চেয়ে সত্য আর কিছু নেই।'

কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন জাকারিয়ুস। অচৈতন্যের মত মেজের ওপর পড়ে আছেন তিনি, আর থেকে থেকে ঘড়ঘড়ে গলায় বিড়বিড় করে বলে উঠছেন, 'জীবন···বিজ্ঞান···জীবন···বিজ্ঞান।'

এমন সময় এল ওরা দুজন। রঙ্গমঞ্চে দুই চরিত্রের আবির্ভাবের মত প্রবেশ করলেন নতরদামের যাজক আর ওবেরতুন। জাকারিয়ুস মেজের ওপর পড়ে আছেন, তাঁর পাশে বসে অবিরাম প্রার্থনা করে চলেছে জেরাদঁ।

এবার ঘণ্টা বাজার আগে ঘড়িতে যে এক ধরনের কর্কশ আওয়াজ

শোনা যায় তা কানে যেতেই লাফিয়ে উঠেছেন জাকারিয়ুস তাঁর ভূমিশয্যা ছেড়ে।

—মধ্যরাত্রি, চেঁচিয়ে উঠেছেন তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে যাজক হাত বাড়িয়ে দিলেন সেই প্রাচীন ঘড়িটার দিকে।

আর তাতেই যেন স্তব্ধ হয়ে গেল ঘড়িটা। আর কোন শব্দ নেই। মধ্যরাতের ঘণ্টা আর বাজল না সে ঘড়িতে।

এক হৃদয়বিদারী আর্ত চীৎকার করে উঠলেন জাকারিয়ুস। আর প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল দূরে। আর তাকিয়ে দেখলেন ঘড়ির ডায়ালে ফুটে উঠল শেষ অনুশাসন।

'ঈশ্বরের সমান হবার চেষ্টা করবে যে মানুষ, চিরকালের মত তার ঠাঁই হবে নরকে।'

একটা বজ্রপাত হল যেন আর সঙ্গে সঙ্গে ফেটে গেল সেই পুরনো ঘড়ি। ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল তার স্প্রিংটা আর অতিকায় সাপের কুণ্ডলীর মত তালগোল পাকিয়ে যাওয়া গোল পেঁচানো তারটি। বিধ্বস্ত মানুষটি যিনি এককালে সেরা ঘড়ি-কারিগর বলে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন, ছুটে গেলেন সেটি কুড়িয়ে নেওয়ার জন্যে আর বারে বারে ভাঙা গলায় বলতে লাগলেন, 'আত্মা, আমার আত্মা—'

যেন জীবন্ত হয়ে উঠল সেই কুণ্ডলী পাকানো তারটি। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠল মেজের একপাশ থেকে আর একপাশে। আর প্রাণপণ চেষ্টা করেও ক্লান্ত পরাজিত জাকারিয়ুস তার নাগাল পেলেন না কিছুতে।

শেষে সেটা কুড়িয়ে নিল পিত্তানোচ্চিয়ো। তারপর ভীষণ এক পাপবাক্য উচ্চারণ করে যেন মাটি ভেদ করে তলিয়ে গেল কোন অতল গহ্বরে কে জানে।

চিৎপাত হয়ে মেজেতে পড়ে রইল নিস্পন্দ মাস্টার জাকারিয়ুসের নিষ্প্রাণ দেহ।

আদেঁরনাতের সেই গিরিকন্দরের এক টুকরো ফাঁকা জমিতেই সমাধিস্থ করা হয়েছিল বৃদ্ধ ঘড়ি নির্মাতাকে। এক মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতার পর ওবের আর জেরাদঁ ফিরে এসেছিল জেনেভায়। তাদের জীবনের বাকি দিনগুলোয় এক দিকভ্রান্ত বিজ্ঞানপ্রেমীর আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা করতে ভুল হয় নি তাদের কোনদিন।

——